এক অঙ্গে এত রূপ

এক অঙ্গে এত রূপ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৫, মার্চ ১৯৫৯

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

সূচী

দর

'কত নেবে ?'

আমূল চমকে উঠেছিল রমলা।

কিন্তু, একমুহূর্ত ভেবে দেখল, প্রসঙ্গটা অন্যরকম। প্রসঙ্গটা অন্যরকম ব'লে ভয়ের কারণ কি অল্প ? কই থাক-যাক চেঁচিয়ে উঠল না তো !

'কত নেবে তা আমি কি ক'রে বলি।' রমলা মুখে একটি মুমূর্ষু রেখা টানল হাসির। বললে, 'ওঁকেই জিগ্‌গেস করো না।'

'তুমিই বলো না একটু আমার হ'য়ে। যদি মামলাটা বিনে ফি-তে ক'রে দেয়।' ব'লে নিজের দিকে নিজেই চোখ ফেলল মুরারি : 'দেখছো তো আমাকে।'

নিজেরও অজান্তে জোরে একটা নিশ্বাস এল বেরিয়ে। এক নজরে অনেক যেন দেখে ফেলল রমলা। দুর্দিন আর দুর্গতির জলজ্যান্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'মামলাটা কিসের ?' রমলার স্বরে সলজ্জ অনিচ্ছা।

'উচ্ছেদের।'

'ভাড়া বাকি পড়েছে ?'

'না। না খেয়েদেয়ে যেমন ক'রে পারি ভাড়া যুগিয়ে এসেছি ঠিক। উচ্ছেদ চাইছে যেহেতু বাড়িওলা বলছে তার নিজের দরকার।' নিজের থেকেই বলবে কি না দ্বিধা করতে লাগল মুরারি : 'কার বেশি কার কম তাই নিয়েই জগৎজোড়া ঝগড়া।'

দ্বিধা যাতে না প্রশ্রয় পায় তেমনি দ্রুত ভঙ্গি করল রমলা। 'আচ্ছা আমি ব'লে দেখব।'

'নথিটা একবার দেখবে?' হাতে ফিতেবাঁধা দুটো কাগজের তাড়া। একটা তাড়ার ফিতে খুলল মুরারি।

'আমি নথির কি বুঝি?' একটু কি পিছিয়ে গেল রমলা?

'না, বুঝবে।' এক পা এগিয়ে এল মুরারি: 'যে-যে দলিল মামলায় একজিবিট হবে তা সব বাংলায় লেখা। আর সবই তোমার হাতের।'

'আমার হাতের?' ঘরের দেয়ালঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল নাকি?

'এই দেখ না।' নথিটা অবিশ্যি ছেড়ে দিল না মুরারি। দূর থেকেই মেলে ধরল। দূর থেকেই চিনতে পারল রমলা। ক'টা চিঠি আর ফটোগ্রাফ। মুখের প্রদীপ নিবে গেল এক ফুঁয়ে। সন্দেহ কি, তারই চিঠি তারই ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফের মধ্যে ক'টা একক ক'টা বা সংযুক্ত। সংযুক্তের মধ্যে ক'টা বা অসতর্ক।

'তোমার মামলায় এ সব দলিল লাগবে কি করতে?' কান্নার মতোই শোনাল বুঝি কথাটা।

মুরারি হাসল। বললে, 'আমার উচ্ছেদের মামলা কি একটা? তাই দয়া ক'রে ব'লে দেখ না তোমার স্বামীকে।'

'বলব।' চোখের কোণে একটু তাকাল রমলা।

'তোমাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই বুঝি?'

'এখনো হয় নি।'

'আমি আবার আসব কাল।'

চোখ না তুলে ঝাপসা গলায় বললে রমলা, 'যদি আস তো দুপুরে এস।'

রমলা ভেবেছিল সুহাস নিজের থেকেই বুঝি কিছু বলবে। বৈঠকখানা থেকে উপরে উঠে এ সময়টায়— কোর্টে বেরুবার আগে পর্যন্ত— কেমন অন্যমনস্ক উদাসীনের মতো থাকে সুহাস। মামলা ভাবে না মক্কেল ভাবে না মনে-মনে সওয়াল-জবাবের মহড়া দেয় কে বলবে। দশ মিনিটের মধ্যেই দাড়ি কামানো ও স্নান সারে, সাত মিনিটে খেয়ে ও পাঁচ মিনিটে পোশাক প'রেই ট্রাম ধরতে ছুট দেয়। এ সময়টায় একটু ভালো ক'রে গুছিয়ে-গাছিয়ে কোনো কথাই বলা যায় না। যেন তরোয়ালের ডগায় চ'ড়ে থাকে।

তবু ভাবছিল এমন একটা কথা, বোধ হয় বলবে। সাড়ম্বরে না হ'লেও, এমনি, কথায়-কথায়। তার কোর্টের নথি বা নজিরের স্তূপ তা পারবে না চাপা দিতে।

কিছু বলছে না দেখে নিজেই উদ্যোগী হ'ল রমলা। ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল। বললে, 'তোমার এক মক্কেল এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ও, হ্যাঁ, কে বলো তো?' যেন কত মক্কেল আসে এমনি লেপাপোঁছা মুখ করলে সুহাস।

'আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমার জেঠতুতো বোনের মাসতুতো দেওরের—'

'কি একটা। প্রায় দূর-দূর সম্পর্কের।'

'প্রায় তাই।' হেসেই আবার গম্ভীর হ'ল রমলা: 'তোমার মক্কেলকে আমার কাছে পাঠাতে গেলে কেন?'

'বা, তোমার সঙ্গে যে দেখা করতে চাইল।' একমনে গালের এক জায়গায়ই বারে-বারে ব্রাশ ঘষতে লাগল সুহাস: 'বললে কি রকম আত্মীয় হয় তোমার—'

'তাই তুমি পাঠিয়ে দেবে ভিতরে ?' মুখেচোখে রাগের ঝাঁজ আনল রমলা।

'আমি না পাঠালেও তো ইচ্ছে করলে একটা লোক আসতে পারে বেটাইমে, ধরো ঠিক ভরদুপুরে। কড়া নেড়ে অনায়াসেই খুলিয়ে নিতে পারে দরজা।'

'ইস!' আবার ঝলস দিল রমলা : 'যাকে-তাকে দরজা খুলে দিলেই হ'ল!'

'এ ক্ষেত্রে তো একেবারে যাকে-তাকে নয়। আত্মীয়। মুরুব্বি। হয়তো ভাবলে তোমাকে দিয়ে মামলার ফি-এর যদি কিছু সুরাহা করা যায়।'

ভ্রূরেখা বঙ্কিম করল রমলা : 'মামলা! কিসের মামলা!'

'উচ্ছেদের মামলা। যা আজকাল চলছে আকছার—'

'কেন, করেছে কি ?'

'করে নি কিছু। হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' গলার কাছটায় কাঠ-কাঠ লাগতে লাগল রমলার। বললে, 'নথি পড়েছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, দেখলাম প'ড়ে।' কামানো বন্ধ ক'রে আয়নার সামনে খানিক পায়চারি করল সুহাস : 'দু-খানা ঘর আর ভিতরে এক চিলতে বারান্দায় একটা ভাড়াটে বাসা, কল বাথরুম আলাদা। ভাড়া সস্তা বলতেই হবে, সাতচল্লিশ টাকা সাড়ে তের আনা। তাই বাড়িওলার বুকশূল। সমস্ত উৎপাতের অবসান এখন উৎখাতে।'

'বাসিন্দে ক'জন ?' সাহস কুড়িয়ে পেল রমলা।

'আটজন। যে এসেছিল, ঐ ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ভদ্রলোক, তার বাপ মা, ছোট দুই ভাই এক বোন—'

'আর বাকি দু-জন বুঝি ভদ্রলোকের স্ত্রী আর ছেলে!'

'না, না, বিয়ে করে নি ভদ্রলোক। ভাগ্যিস করে নি।' খুর তো নয় যেন জল চ'লে যাচ্ছে সুহাসের গালের উপর দিয়ে। তার জীবন এমনি নিটোল-নিষ্কণ্টক। বললে, 'বাকি দু-জন বিধবা এক দিদি আর তার এক মেয়ে—'

'ঘর দুটো বড়ো কতটা? লম্বাই-চওড়াই—'

'সে সব মাপজোখ হ'য়ে আছে। যৎসামান্য। চারজন ক'রে পুরুষ-মেয়ে আছে দু ঘরে ভাগাভাগি ক'রে। মাছপাতুরি হ'য়ে। বাড়িওলা এমন কানকাটা ঐ বাসা থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে চায়। হেতু? বাড়িওলা মফস্বলে থাকে, কি নামহীন কঠিন অসুখ করেছে, গত্যন্তর নেই, চিকিৎসা করাবে কলকাতায় এসে, তাই ঘরের প্রয়োজন। দাঁড়িপাল্লা বাড়িওলার দিকে ভারি। তাই এবার উঠে যাও, স'রে পড়, পথ দেখ।'

'তা দেখবে। যাবে উঠে।' যেন গায়ে লাগে না এমনি ভাব করল রমলা।

'বলো কি? উঠে যাবে?' গাল কেটে গেল নাকি সুহাসের?

'তা নয়তো কি! একটা মরণাপন্ন রুগীর চিকিৎসা হবে না? বিশেষত সেই রুগীরই যখন এটা নিজের বাড়ি।'

'আইন অত সহজ নয়।' আবার চলতে লাগল খুর।

'কমনসেন্সের বিরুদ্ধেও নয়।' বললে রমলা, 'আমার বাড়ি, আমার দরকার, ব্যস আর কথা নেই।'

'না, কথা আছে। আমি যাই কোথায়?'

'তার আমি কি জানি!'

'এইখানেই আইন আসছে তৌল করতে। গোড়ায় তবে ভাড়া

দিয়েছিলে কেন? কেন জমি দিয়েছিলে চাষ করতে? আমার টাকার দরকার, বুঝি, তুমি মহাজন, কেন খুলতে গিয়েছিলে থলের মুখ? সুতরাং দু পক্ষ, আর যে পক্ষ দুর্বল আইন এখন তার দিকে। চাষাড়ে বাসাড়ে খাতকের দিকে। হ্যাভ-নটদের দিকে।'

'কিন্তু কে হ্যাভ আর কে হ্যাভ-নট সেইটেই প্রশ্ন।'

'হ্যাঁ, সেইটেই প্রশ্ন।'

'যার বিছানা নেই অথচ ঘুম আছে সে হ্যাভ-নট, না, যার বিছানা আছে ঘুম নেই— সে? কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে,' হাসল রমলা: 'এ মামলা তোমার কাছে এল কি ক'রে?'

'আমার কাছে আসে নি সরাসরি।' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগল সুহাস: 'যে ফাইলিং প্লিডার ছিল তার সঙ্গে, কি না জানি নাম ভদ্রলোকের—'

'মুরারি ঘোষ—' নিঃসংকোচে বললে রমলা।

'হ্যাঁ, মুরারি ঘোষের ফি নিয়ে না কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। মামলা থেকে রিটায়ার করেছে উকিল। তখন গিয়েছে ভবেনবাবুর সেরেস্তায়। ভবেনবাবু—'

'ভবেন দত্ত? যিনি তোমার সিনিয়র?' কৌতূহলে চোখ নাচাল রমলা।

'হ্যাঁ, উচ্ছেদের মামলার পাকা খেলোয়াড়। তাঁর কাছে যেতেই বলেছেন. জুনিয়র ছাড়া কাজ করি না, তাই সুহাস চাটুজ্জেকে শামিল করো।' গর্বের সুর আনল সুহাস: 'তাই আমার কাছে আসা। কিন্তু ঐ দন্ত্য-সই সার, তালব্য-শ নেই অদৃষ্টে—'

'তার মানে আশা নেই?' চট ক'রে ধ'রে ফেলল রমলা।

'মামলার নয়, ফি-এর। ভবেনবাবুর বত্রিশ টাকা না দিয়ে

পারবে না, কিন্তু আমার বেলায় অষ্টরম্ভা—' বাঁ হাতের চেটোয় খানিকটা তেল নিয়ে ব্রহ্মতালুতে ঘষতে লাগল সুহাস।

'তার মানে? কি বলছে তোমাকে?'

'বলছে— বলছে অমনি ক'রে দিতে।'

'অমনি? মাগনা?' আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল রমলা।

'মামার বাড়ির আবদার দেখ না। আমি বললুম, অসম্ভব। বিনা ফি-এ পারব না কাজ করতে।'

হাত না রেখেও গায়ের গরম টের পাওয়া যায় এমনি ঝলস দিয়ে রমলা বললে, 'কখনো না।'

'তখন বললে কি জানো?' চুপি-চুপি কাছে আসার ভঙ্গি ক'রে ঝাপসা গলায় সুহাস বললে, 'তখন বললে আমি আপনার স্ত্রীর আত্মীয় হই। ওর সঙ্গে যদি একটু দেখা করতে দেন! যদি ও একটু সুপারিশ করে! তখন আর 'না' বলি কি ক'রে? বললাম, যান ভিতরে—'

'আত্মীয় না হাতি!' রাগের আবার একটা তরঙ্গ তুলল রমলা: 'আর আত্মীয় হ'লেই বা কি। উদরান্ন, মামলার ফি ছাড়বে কেন? ফি নিয়ে রোজগার, ওকালতি তো আর খয়রাতি নয়। সবাইকে দেবে, সরকারকে রশুম আমলাকে ঘুষ তদবিরকারককে মেহনতানা। কিন্তু যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করবে, সেই উকিলকেই শুধু কাঁচকলা! কখনো না, কখনো ফি ছাড়বে না তুমি। এমন কিছু আত্মীয়তা নয় যে মুফত করতে হবে। কথায় বলে, উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্বি দিয়ে রাখা—'

'না না, আমি ব'লে দিয়েছি, আমার ফি না দিলে ভবেনবাবুকেও পাবেন না।' বাথরুমের দিকে এগোল সুহাস।

'ভবেনবাবু তো বত্রিশ নেবেন,' মুহূর্তের একটি ভগ্নাংশ দ্বিধা করতে চেয়েও দাঁড়াতে পারল না রমলা : 'তুমি কত নেবে ?'

চকিত তড়িতের দীপ্তিতে দু-জনের চোখোচোখি হ'ল।

আবার সেই প্রশ্ন।

'কত নেবে ?'

আবছা হ'য়ে আসা দিনের আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে তেমনি ধূসরস্বরে জিগ্‌গেস করল সুহাস।

মেয়েটি দরজার পাশটিতে স'রে দাঁড়াল।

'যাব ?'

এক মুহূর্ত কি ভাবল মেয়েটি। স্বরে সমীচীন অস্পষ্টতা এনে বললে, 'আসুন।'

আসুন ! সুহাসের বুকের ভিতরটা দুলতে লাগল তাণ্ডবের মতো। কত পকেটে আছে মনিব্যাগে ঠিক মনে করতে পারছে না। কোন পাহাড়চূড়ার দাম চেয়ে বসে তার ঠিক কি। মনে হ'ল সেটা মোটেই প্রশ্ন নয়। মনে হ'ল, অদ্ভুতের দেশে এ আশ্চর্যও সম্ভব, এমন আকাশ-কুসুমও চয়ন করা যায় মর্তের ধূলিতে। সোনালী মেঘ ধরা যায় হাত বাড়িয়ে, হয়তো বা পাহাড়ের মুকুট, কিন্তু ফণাতোলা সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে নেওয়া যায় এ কল্পনার অতীত। সজ্ঞান শরীরে চিন্তা করাও যেন কষ্টকর।

আসুন ! জাগা চোখের স্বপ্নের মতো মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।

জোরালো রেখায় এক টানে আঁকা সরল দীর্ঘাঙ্গিনী। গায়ের রংটি ক্ষমাহীন কালো। কিন্তু সে কালোয় অগ্নিশিখার রক্তিমা। পরনে হলদে রঙের শাড়ি, চওড়া সবুজ পাড়, গায়ে সাদা চিকনের ব্লাউজ,

খোঁপায় এক থোকা রঙ্গন। চারদিক থেকে একটা এলোমেলো অমিলের ঝড়, কিন্তু তার মধ্যে সম্বদ্ধ ছন্দে একটি অব্যর্থ উচ্চারণ।

হয়তো বা আজ দরে বনবে না। অসম্ভবের পায়ে মাথা ঠুকেও না। আজ না হোক, একদিন এই অসম্ভবকেই নড়াবে সুহাস, বিগলিত করবে। যা কিছু তার আছে সমস্ত বিক্রি ক'রে, পাট্টা দিয়ে, বন্ধক রেখে। চূড়ান্ত সর্বস্বান্ত হ'য়ে।

চোখের উপর একবার চোখ ফেলল মেয়েটি। সুহাসের মনে হ'ল ও চোখ মেললেই দিন আর ও দু চোখের পাতা একত্র করলেই রাত।

সদর পেরিয়ে ছোটো একটি উঠোন, কলতলা। মেয়েটির পিছে-পিছে ভিতরে ঢুকল সুহাস। হঠাৎ গা কেমন ছমছম ক'রে উঠল, আর সব বাসিন্দেরা কই? ডাকের গয়নাপরা পুরোদস্তুর প্রতিমা দূরের কথা, একমেটে দোমেটেদেরও তো আভাস নেই। এ সে কোথায় এল?

'দাদা, মেজদা, দেখ তো কে একটা লোক কি সব বলছে আমাকে—' মেয়েটি হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল।

'কি, কি হয়েছে রে রমলা?' কাছাকাছি কোথাও আছে, দুই পরুষকণ্ঠ গর্জে উঠল সমস্বরে।

সন্দেহ কি, ভুল করেছে সুহাস, মরণাত্মক ভুল। নইলে গোটা রান্নাঘর হয়, গোটা ড্রয়িংরুম? বারান্দায় হরিণের শিং থাকে? অয়েল পেণ্টিং?

কিন্তু এখন করবে কি? পালাবে? ছুট দেবে? পাড়াসুদ্দু সবাই যদি পিছু নেয়? মুষল বৃষ্টি শুরু করে? তিলকে তাল বানিয়ে ছাড়ে?

না, দাঁড়াই মুখোমুখি। অন্যায় স্বীকার ক'রে মার্জনা চেয়ে নিয়ে চ'লে যাই।

'বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে দাদা—' রমলা আবার ত্রাহি ডাক ছাড়ল।

গলিটা যে ঐ গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে, এ বাড়ি যে ঐ গলির লপ্ত নয় সেটা তখন বুঝতে পারে নি সুহাস। এখন সহজ-পাঠের মতো বুঝতে পারল এ গোবরগাদা নয় এ পদ্মফুল, এ ধুলো নয় হীরের গুঁড়ো, আবর্জনা নয় আরতির দীপমালা।

গঙ্গাজলের ছিটে-লাগা তুলসীপাতা।

এক ভাই এসে হাত চেপে ধরল, দরজা আগলাল আরেক ভাই।

'আমার সঙ্গে দর করছে।' দিব্যি বলতে পারল রমলা : 'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম সিনেমায় যাব ব'লে, মুরারিদা ট্যাক্সি আনতে গেছে—'

'কি ভেবেছেন ?' হাতটা মুচড়িয়ে ধরল বড়দা।

'ভুল ভেবেছি। ভুল হ'য়ে গেছে।' দু-হাত যে নমস্কারে যুক্ত করবে তার উপায় নেই। সুহাসের মুখ লজ্জায় শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে : 'মার্জনা চাই।'

'আপনি ভদ্রলোকের ছেলে— করেন কি ?' মারমুখো বড়দার চোখ।

'ছাত্র। ল কলেজের ছাত্র।'

'আপনার এই মতিগতি ?'

'একটু ভুল পথে— বিপথে চ'লে এসেছি।' যে হাতটা মুক্ত আছে তাই দিয়ে একবার কান চুলকোল সুহাস : 'তারপর ভুলের পরে ভুল— গোড়াতে ভুল করলে বারে-বারেই ভুলের সম্ভাবনা—'

'লজ্জা করে না ?'

‘এখন করছে।’

‘এখন করছে? লোফার, ইডিয়ট—’ আরো নানা সম্ভাষণ বর্ষণ করতে লাগল দাদারা: ‘জানো তোমাকে এবার পুলিশে দিতে পারি?’

‘পারেন, ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাস হয় বটে, কিন্তু আমার পক্ষেও কিছু বক্তব্য থেকে যাবে—’ ভয়ে-ভয়ে স্থহাস তাকাল রমলার দিকে: ‘আমাকে উনি আস্থন বললেন কেন? কেন দরজার বাইরে থেকেই দিলেন না তাড়িয়ে?’

মূর্তিমতী ছলনা, রোষস্থন্দর চোখে তাকাল রমলা। যেন দুই চোখে নয় তিন চোখে তাকাল। যে এমন দুর্বার তাকে না ব'লে করি কি— তৃতীয় চোখের যেন সেই অনুক্ত উচ্চারণ।

‘যদি ব'লে থাকে তা আত্মরক্ষার জন্যে—’ বললে মেজদা।

‘তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে—’ বড়দা হাতে আবার একটা মোচড় দিল।

ভিড় জ'মে গেল আস্তে-আস্তে। সবাই একবাক্যে তারিফ করল রমলার। আততায়ীকে ধরবার জন্যে কেমন স্থন্দর কৌশল করতে পারল। যদি গোড়াতেই প্রত্যাখ্যান ক'রে সরিয়ে দিত তা হ'লে এই দুর্ধর্ষ অনাচারের শাসন হ'ত কি ক'রে?

কেউ-কেউ বললে, উত্তমমধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিন।

‘বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমি তেমন অন্যায় কিছু করি নি। শুধু দর জিগ্‌গেস করেছি। যদি ফিলসফিক্যাল ভিউ নেন—’ স্থহাস চাইল নৈর্ব্যক্তিক হ'তে।

কেউ-কেউ বললে, মেয়ের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও।

‘তাই। চাও ক্ষমা।’ দু দাদা একমত হ'ল।

'ও সব নাটকীয় কিচ্ছু করতে পারব না।' সুহাস বড়দার দিকে তাকাল বিমর্ষ চোখে : 'হাতটা ছেড়ে দিন, করজোড়ে নমস্কার ক'রে বিদায় নিচ্ছি।'

'নাটক চাও না, সার্কাস চাও?' নাকের উপর ঘুষি মেরে বসল বড়দা।

আর টাকা যেমন টাকা টেনে আনে মারও তেমনি টেনে আনে মহামার।

'তাকা, তাকা, চোখ চা, চোখ চা ভালো ক'রে—' মেয়ের দল ওসকাতে লাগল রমলাকে।

শুভদৃষ্টির সময় সব মেয়েই একটু ঢলা-ঢলা ভাব করে কিন্তু তুই একটা বুড়োধাড়ি গ্রাজুয়েট মেয়ে, তোর কেন এই রং-ঢং? সিধে চা না চোখের দিকে। কেমন রাজপুত্তুরের মতো বর!

নাকের উপর সেই কাটা দাগটা চিনতে পারল রমলা।

দু-হাতে ক'রে মালা গলায় ঢেলে দেবে, তা নয়, দু-হাতে ক'রে চশমার ডাঁটি দুটো আস্তে-আস্তে তুলে ধরল সুহাস।

আর কেউ চিনতে পারে নি কিন্তু তুমি পারবে। তারা বিষয় দেখেছে, তুমি ব্যক্তিকে দেখেছ। তাদের কাছে আমি ছিলুম একটা মামলা মাত্র, তোমার কাছেই আমি মক্কেল, বিশেষ একটা অবস্থার প্রতিচ্ছায়া। আর ওরা ছিল সব হাকিম, ন্যায়ধর বিচারক। হাকিম কি মক্কেল চেনে? হাকিম শুধু মামলা দেখে। মামলা-মাফিক দণ্ড দেয়।

আর-সকলের চোখে ছিল ক্রোধ, তোমার চোখে ছিল ঘৃণা। ক্রোধের চেয়ে ঘৃণা বেশি ক'রে দেখে। ক্রোধের চেয়ে ঘৃণা বেশি ক'রে মনে রাখে।

তাই চিনতে পারল রমলা। শুধু নাকের কাটা দাগ নয়, সমস্ত মুখটা। বুকের ভিতরটা এতটুকু হ'য়ে গেল।

ছি ছি ছি! সেদিন অকারণে তাঁকে কি অপমান করলুম! 'আসুন' বলেছিলুম ব'লেই না ঢুকেছিলেন ভিতরে, ঢুকতে সাহস করেছিলেন। আর, আশ্চর্য, নিজেরও অগোচরে কি ক'রে 'আসুন' শব্দটা এসেছিল জিভের আগায়।

ওটা বুঝি নিয়তির ডাক।

কত কৃতী হয়েছেন আজ, কত গুণী। কত উঁচু ঘরের ছেলে। কেমন শোভনদর্শন! সোনার মেডেল পেয়েছেন পরীক্ষায়। উজ্জ্বল হবেন ব'লে উকিল হয়েছেন। চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেন্সির ক্লাস খুলেছেন— কত রোজগার। কত নামডাক বাজারে।

সেদিন অমনি ক'রে অপমান করেছিল ব'লেই তো দুর্মদ প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে ক'রে হোক, পেতেই হবে রমলাকে। যে ডাকে অথচ ধরা দেয় না ধরতে হবে সেই অধরাকে। নিমন্ত্রণ ক'রেও যে উপবাসী রাখে লুট করতে হবে তার অন্নভাণ্ডার।

আর সে লুটের একমাত্র পথ, মামুলি রাজপথ,— বিয়ে।

হ্যাঁ, সেই পথই বহু ধৈর্যে তৈরি করবে সুহাস। যাতে একবাক্যে একনজরে বলতে পারে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে জি-টি রোড! যাতে আর প্রত্যাখ্যানের কথা না ওঠে! খোয়া পিচ দুরমুশ রোলার— সব একে-একে যোগাড় করল— প্রশস্ত করল মসৃণ করল সুন্দর করল। এবার তবে টপ-গিয়ারে দাও ফুল স্পিড।

ঘটক পাঠাও।

ঘরে-দোরে নিখুঁত মিল, সবাই লাফিয়ে উঠল। শুধু বড়দা মেজদা নয়, আবালবৃদ্ধ সমস্ত পরিবার।

কিন্তু এত বড়ো সৌভাগ্য কি ক'রে সম্ভব ? ঐ তো মেয়ের ছিরি, ঐ তো মেয়ের ছাঁদ !

কে জানে কি। কোথায় কি দেখেছে না শুনেছে তাই থেকে উচাটন। আসল কথা কি জানো ? যার হাঁড়িতে যার চাল। যেখানে, আছে লেখা সেখানেই হবে দেখা।

'দাবি-দাওয়া আছে ?'

'হ্যাঁ, বরপণ আছে বৈ কি।' ঘটক ভারিক্কি চালে বললে।

'কি বরপণ ?'

'বরপণ মানে বরের পণ। বরের প্রতিজ্ঞা।' দুই গাল হাসল ঘটক : 'শ্রীমান প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ক'রেই হোক বিয়ে করবেনই শ্রীমতীকে।'

সবাই আশ্বস্ত হ'ল। এবার তবে খোঁজ নিতে হয় প্রাক্তন খুঁত কিছু আছে কিনা ছেলের।

অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে হাজির হ'ল দাদারা। বন্ধুরা চোখ টিপল। বললে, 'সোনার আংটি কি বাঁকা হয় ? যদি একবার শালগ্রাম হ'য়ে ওঠা যায় তখন আর তাকে কেউ নুড়ি বলে না। দেবতা হ'য়ে উঠতে পারলে সবই তখন তার লীলাখেলা।'

'তবে ?'

'তবে—এ নিয়ে আবার একটা কথা ওঠে নাকি ? উঠতি বয়সে কারু মুখে যদি ব্রণ ওঠে তাই নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায় ?'

কিন্তু তুই হাতির হাওদায় চড়া ছেলে তুই কেন নামবি এত নিচে ? দেওয়া নেই থোওয়া নেই, কেন শুধু-শুধু শুকনো চিঁড়ে চিবুতে যাবি ? আর মেয়েকেও তো দেখে এলাম ! লাবণ্যের টানটোন আছে বটে কিন্তু অখণ্ড কালো। তুই ওর মধ্যে দেখলি কি ?

আশ্চর্যকে দেখলাম। যাকে লোকে মানতে চায় না অথচ জানতে চায়, দেখলাম সেই অলৌকিককে।

'কত নেবে?' বিয়ের রাত্রে নিবিড় স্পর্শের মধ্যে নিমন্ত্রণ ক'রে রমলাকে জিগ্‌গেস করল সুহাস: 'আরো কত নেবে? কত শ্রম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা, কত সংকল্প?'

নিচে কড়া ন'ড়ে উঠল।

দুপুরটা রমলা একা, একেবারে একা।

কড়া নড়ার ভাষা রমলার মুখস্থ। কোনটা ইস্কুলী দেওরের, কোনটা কলেজী ঠাকুরঝির। কোনটা চাকরের, কোনটা বা উকিলবাবুর। এ ভাষা মুখস্থের বাইরে। এ ভাষা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। এ ভাষা ভয়েব স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি।

তবু নামল রমলা। ভয়ও ডাকে, ভয়ও আকর্ষণ করে।

দরজা খোলার আগে বিশেষ একটি ফাঁক দিয়ে বোঝা যায় বাইরে কে দাঁড়িয়ে। তেমনি একটি কৌশল তৈরি ক'রে দিয়েছে মিস্ত্রি। সুহাসের সতর্ক বারণ, আগে নিশ্চিত না হ'য়ে যেন খোলে না দরজা। সেই কে ফিরিওয়ালা হাত চেপে ধ'রে হার-বালা কেড়ে নিয়েছিল, মক্কেল সেজে এসে কে বা বৈঠকখানা থেকে সরিয়েছিল বই, কে বা নাকে রুমাল চেপে ধ'রে একেবারে দিয়েছিল শেষ ক'রে।

দরজা খুলে দিতেই নিভ্রূক্ষেপ ঘরে ঢুকল মুরারি। অবান্তরে না গিয়ে সরাসরি বললে, 'কি, বাগাতে পারলে স্বামীকে?'

'কত চান তিনি ফি?'

'ষোল টাকা।'

বেশি কথার মধ্যে রমলাও যেতে চাইল না। বললে, 'আমি

টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি, কেমন ? তাই তুমি তাকে দিয়ে দিও। হরেদরে তা হ'লেই তো হিসেব মিলে যাবে।'

এক মুহূর্ত কি ভাবল মুরারি। বললে, 'মন্দ কি, তাই দাও।'

ব্যবসাবাণিজ্য যখন, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। দ্রুত পায়ে উপরে চ'লে গেল রমলা।

হঠাৎ মনে হ'ল মুরারির, পিছু-পিছু উঠে গেলে কেমন হয় ? যে টাকা দেয় সে কি আরো কিছু দিতে পারে না ? কিন্তু, না, ব'সে রইল। তাকিয়ে রইল পায়ের জুতোর দিকে। যেতে হ'লে ও দুটো নিচে রেখে যেতে হয় বুঝি। ভাবল মাথার উপরে একটি ছাদ, রোদে-বৃষ্টিতে একটি শুধু মাথা গোঁজবার জায়গা। এর চেয়ে বড়ো কামনার জিনিস আর কি আছে ! সমস্ত আকাঙ্ক্ষার আকাশ যদি কিছু থাকে তো তা ছাদ। ক্ষুধার অন্নের যে এত হাঁকডাক, খাই কোথা যদি মাথার উপরে আচ্ছাদন না থাকে। তাই আগে একটি ঘর পরে অন্য কিছু, সব কিছু, জীবনের সমস্ত ঘোরাফেরা।

নিচে নেমে এল রমলা। বললে, 'নাও।' গুনে তিনটে নোটে ষোল টাকা বাড়িয়ে ধরল।

মুরারি দিব্যি নিল হাত পেতে। চোখের দিকে চাইতে পর্যন্ত ভুলে গেল। এর পরে আর যেন তার কিছুই চাইবার নেই। বলবার নেই। ব'সে যাবার নেই।

'যাই, কোর্টে ধরি গে সুহাসবাবুকে।'

সুহাস বাড়ি এলে কথায়-কথায় জিগগেস করল রমলা, 'তোমার সেই আত্মীয় মক্কেল কিছু ফি-টি দিল ?'

'কোর্টে আটটি টাকা দিয়েছে আজ।' জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে সুহাস।

'কেস করছ ওর ?'

'না ক'রে করি কি। উচ্ছেদের ডিক্রি মানে খোলা মাঠে আকাশের বাজ।' ক্রিজ টিপে ধ'রে ট্রাউজার্স টানতে-টানতে সুহাস বললে, 'দেখি আরো কিছু পারি কিনা আদায় করতে।'

'নিশ্চয়। তোমার টাকা তুমি ছাড়বে কেন ? আঙুল বাঁকা ক'রে ঘি তুলতে হবে।' চোখ নাচাল রমলা: 'ফাঁকে-ফিকিরে ফন্দিতে-সন্ধিতে—'

'যে পাচ্ছে আদায় ক'রে নিচ্ছে।' কলারের বন্ধন মুক্ত ক'রে এবার শার্ট খুলছে সুহাস: 'একটা লোককে পাকড়ে ধরেছে সবাই— উকিল আমলা মুহুরি সরকার। সরকার নিচ্ছে রশুম, উকিল নিচ্ছে ফি, আমলা ঘুষ আর মুহুরি হোয়াট নট ? কিন্তু বেচারী মক্কেলের থাকবার একটু ঘর চাই তো! এ কে তাকে দেয় আদায় ক'রে ?'

'কি রকম বুঝছ ?' পাখাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিল রমলা।

'মামলার কি কেউ বোঝে ? সব নসিব। সব কালিঘাটের মানত।'

'তবে তোমরা আছ কি করতে ?'

'রোজগার করতে।'

রোজগারের পথ মন্দ বার করে নি মুরারি। আবার এসেছে। আবার। হাতে-হাতের সমনে সাক্ষী আসছে না, কোর্টের যোগে আনাতে হবে, আর, কোর্টের চৌকাঠ মাড়িয়েছ কি, পয়সা। দলিল তলব করতে হবে, তার নকল বার করতে হবে রেজেষ্ট্রি আফিস থেকে, তার খরচ। সাক্ষী বাগাতে হবে, সাক্ষী ভাঙাতে হবে, তার গুনাগার। নানা বায়নাক্কা।

'কিন্তু আমি গরিব মানুষ,' নম্র চোখে বললে রমলা, 'আমি অত যোগাই কি ক'রে ?'

'তোমার স্বামীর খাঁই যে সাংঘাতিক।' কোঁচার খুঁটে গলার ঘাম মুছল মুরারি।

'আমার স্বামীর এতই যখন হাঁকার তখন তাকে ছেড়ে দিলেই হয়।' রমলা মুক্তির পথ চাইল।

'সবাই কি তোমার মতো ছাড়তে পারে? তা ছাড়া,' আরো যেন ভয়াবহ শোনাল মুরারিকে: 'তা ছাড়া, আমার দ্বিতীয় মামলার নথিটা তাকে এখনো দেখানো হয় নি।'

'দ্বিতীয় মামলা মানে?'

'আমার উচ্ছেদের মামলা কি একটা?'

আবার ষোলটা টাকা দিল রমলা। বললে, 'এই কিন্তু শেষ। আমার আর টাকা নেই।'

'কিন্তু মামলার কি শেষ আছে?' টাকা ক'টা ছোট্ট ভাঁজ ক'রে মুরারি রাখল ঘড়ির পকেটে। বললে, 'একতলার পর দোতলা আছে। দোতলার পর তেতলা। গাছের পরে লতা, লতার পরে ফেঁকড়ি। খাজনার পরে বাজনা। রোগের শেষ নেই, ঋণের শেষ নেই, মামলারও শেষ নেই।'

হারলেও যা জিতলেও তাই— আবার জের চলবে? এ তুফান তবে কি ক'রে সামলাবে রমলা? কিসে এই যন্ত্রণার অবসান? কবে এর হেস্তনেস্ত?

'জানো, কাল আমার মকদ্দমা আরম্ভ হবে।' আবার এসেছে মুরারি। বললে, 'এতদিন তোমার স্বামীকে খাইয়েছি, এবার ভবেন-বাবুর কামানে বারুদ ঠাসতে হবে। বলেছেন, পঞ্চাশ টাকা না পেলে দাঁড়াবেন না মামলায়—'

'পঞ্চাশ টাকা!'

'এ তাঁর পক্ষে বেশি নয়, আমার পক্ষে।'

'আমার পক্ষে। আমি এত দিই কোত্থেকে ?' কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝাঁজ আনল রমলা।

'অনেক দিয়েছ, আর তোমার যখন আছে, আর তুমিই যখন পারো দিতে। দিলেই বা।'

'যদি না দিই ?' এক পা এগিয়ে এল রমলা।

'না দাও ?' উঠবার ভঙ্গি করল মুরারি। বললে, 'তা হ'লে সুহাস-বাবুর কাছে গিয়ে দ্বিতীয় নথিটা দেখাতে হবে। আমি উচ্ছেদ হই কি না হই, তোমার উচ্ছেদ অবধারিত।'

চ'লে যাবার ভঙ্গি করতেই দরজা আটকাল রমলা। বললে, 'বেশ, একেবারে নিষ্পত্তি হ'য়ে যাক। তোমার সেই নথিটা, দ্বিতীয় নথিটা বেচো না আমার কাছে। বেচবে ? দাম কত ? কত দাম ?'

'দাম ?' ভীরুর মতো তাকাল মুরারি : 'দাম পঞ্চাশ টাকা নগদ, আর, আর—'

'নগদ তো নেই। এই এক গাছ চুড়ি নাও।' বাঁ হাতের মণিবন্ধ থেকে দুগাছি সোনার চুড়ি টান মেরে খুলে ফেলল রমলা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললে, 'আর ? নথিটা এনেছ ?'

'না, আনি নি। যেদিন আনব সেদিন নথিটা দিয়ে বাকি দাম নিয়ে যাব।' চ'লে গেল মুরারি।

'মনে থাকে যেন।' পিছন ডেকে মনে করিয়ে দিল রমলা।

নথিটা যদি একবার হাত করতে পারি তা হ'লে আর ভয় কি। তা হ'লে আর পায় কে। তা হ'লে আর কে দরজা খোলে। কে দেয় এমন জরিমানা !

'তোমার সেই আত্মীয় মক্কেলের মামলা শুরু হবে কবে ?' বাড়ি ফিরলে সুহাসকে জিগগেস করল রমলা।

'শুরু তো হ'য়ে গিয়েছে। প্রায় সারা বলতে পারো। আজ আর্গুমেণ্ট করলাম।'

'তুমি করলে ? কেন ভবেনবাবু তোমার সিনিয়র ছিলেন না ?'

'কই আর তাকে শামিল করল !' গলার টাইটা দুই টানে খুলে ফেলল সুহাস : 'বলল, দরকার নেই, আপনিই চালান সুহাসবাবু। যদি অদৃষ্টে থাকে আপনার হাত দিয়েই আসবে। আর যদি না থাকে শত ভবেনবাবুও কিচ্ছু করতে পারবে না।'

'তুমি পারবে ?' রমলা হাঁপাতে লাগল : 'তুমি কেন এত বড়ো দায় হাতে নিলে ?'

'তা আমি কি করব !' কলারটা খোলা মানে ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু হালকা হ'ল কই সুহাস ? 'বললে, ভীষণ দুরবস্থা। সিনিয়র দেবার পয়সা নেই।'

'যদি জিততে না পারো ?' ভয়ে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে রমলা।

হাসল সুহাস। বললে, 'এ আবার একটা প্রশ্ন নাকি ? দু পক্ষই কি এক সঙ্গে জেতে ? এক পক্ষকে হারতেই হবে। আর যে পক্ষ হারবে সে পক্ষ হাকিমকে শালা বলবে। এর বেশি আর কি আছে সান্ত্বনা ? কি আছে প্রতিকার !'

'তোমার উচিত ছিল না—' রমলার স্বর প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

'ভাবো কেন ?' গম্ভীর হ'ল সুহাস : 'যদি হারি আপিল আছে। তোমার যখন আত্মীয় তখন আপিলের খরচ না হয় আমি দেব।'

'আর খরচ দিয়ে কাজ নেই।' ঝাপটা মারল রমলা : 'ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। মামলার রায় বেরুবে কবে ?'

'সাতদিন পর।'

কড়া ন'ড়ে উঠল দুপুরবেলা।

নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ নিয়ে মুরারি এসেছে। নিশ্চয়ই ডিসমিস হয়েছে মামলা। আজ রায় বেরুবার দিন।

'আজ রায় বেরুবার দিন।' বললে মুরারি।

'যাও নি কোর্টে?' অস্থির ক'রে উঠল রমলার।

'না। গিয়ে কি হবে? জানতে তো পারবই মামলায় হেরে গেছি।' তক্তপোশে বসল মুরারি: 'যে এক মামলায় হারে সে সব মামলায়ই হারে।'

'হারলেই বা। আপিল আছে।'

'আর আপিল!'

'কেন নয়? খরচ একরকম ক'রে যোগাড় হ'য়ে যাবে।'

'তুমি দেবে? তোমার আর কত আছে?' চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাল মুরারি: 'ও হ্যাঁ, তোমার সেই নথিটা এনেছি। কই দেবে তো দাম।'

না দিয়ে উপায় কি। না দিলে আপিলের বোঝা বইতে হবে দীর্ঘ পথ। তারপরে আবার হয়তো দ্বিতীয় আপিল। একেবারে জেরবার ক'রে ছাড়বে।

নথিটা যদি একবার হস্তগত হয় তবে আমলকীই হাতের মুঠোয়।

'চলো উপরে চলো।' পরিপূর্ণ আহ্বান করল রমলা। বললে, 'এখানে সাংঘাতিক গরম। উপরের ঘরে ফ্যান আছে।'

মুরারি চ'লে এল উপরে, রমলা পিছু-পিছু।

'এ কি, তুমি খালি পা?' চমকে উঠল রমলা।

'জুতো রেখে এসেছি নিচে।'

'সে কি ?'

'ঐ যা জুতো তা দোতলায় ওঠবার উপযুক্ত নয়।' মুরারি বসল চেয়ারে। 'মন্দিরের বাইরে রেখে এলাম।'

পাখা খুলে দিল রমলা। বললে, 'জামাটা খুলে ফেল।'

ছেড়া পাঞ্জাবির নিচে ছেঁড়া গেঞ্জির কি রকম চেহারা স্পষ্ট অনুমান করতে পারছে মুরারি। বললে, 'না, দরকার নেই। এই নাও, নথিটা নাও।'

ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে নথিটা নিল রমলা। সন্দেহ কি, সেই নথি, হুবহু। তার এক বোঝা চিঠি, এক বাণ্ডিল ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফের মধ্যে ক'টা একক, ক'টা সংযুক্ত। সংযুক্তের মধ্যে ক'টা অসতর্ক।

বললে, 'সে কি, দাম নেবার আগেই দিয়ে দিলে ?'

'দিলাম।' শান্ত স্বরে বললে মুরারি, 'আমি উচ্ছেদ হই তো হব, তোমার উচ্ছেদ করি কেন ?' পরে থেমে বললে, 'আমি যতই অভাবী হই আমার ভাবের ঘর ভরা থাক। আমি এবার তবে উঠি।'

'সে কি, বোসো।'

'না, বসি এমন সময় কই ? কোর্টটা ঘুরে আসি। দেখি গ্রেস পিরিয়ড দিল কিনা—' উঠে পড়ল মুরারি। আশ্চর্য, নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

আর, সেই মুহূর্তেই ঝন ঝন ঝন ক'রে ন'ড়ে উঠল কড়া।

'কি হবে ?' মুখচোখ চুপসে গেল রমলার। বললে, 'উনি এসেছেন ! তুমি কি করবে ?' সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়ানো অনড় মুরারিকে ঠেলা মারল রমলা : 'কি করবে ? উপরে যাবে, না, নিচে নামবে ?'

ঝন ঝন ঝন—

সিঁড়ির মাঝখানে থামেব মতন দাঁড়িয়ে রইল মুরারি।

দরজা খুলে দিল রমলা।

'তোমার সেই আত্মীয় মামলা জিতেছে। মামলা ডিসমিস। যে অসুখের চিকিৎসার জন্যে বাড়ির দরকার বলছে সে অসুখের সম্যক চিকিৎসা হবে হাসপাতালে, বাড়িতে নয়। এক সওয়ালেই ডিসমিস হ'য়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, তোমার সে আত্মীয়ের দেখা নেই। মামলার কি ফল হ'ল তা জানতে একবার কোর্টেও যায় নি। তাকেই খুঁজছি। আর তোমাকেও। তুমি বলেছিলে হেরে যাব, কুলোবে না আমার সামর্থ্যে। কি গো সোনামুখি, হারলাম? তুমি আমার পয়া। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে থাকলে কখনো কি হারতে পারি?'

আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে চ'লে এসে সুহাস উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে এগোল। প্রায় আঁতকে উঠল ভূত দেখে। বললে, 'এ কি, আপনি এখানে? আর আমি আপনাকে গরুখোঁজা করছি। আপনি ভেবেছেন আপনার মামলার ফল এখানে, এ বাড়িতে? যান, আপনার জিত হয়েছে। আপিল করতে হয় বাদী করবে। কোর্ট ফি ওর। আপনার জিত। হার কার? হার কারু নয়।'

'যাই তবে রায়ের নকলটা নিই গে—' খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুরারি। ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল রমলা। সিঁড়ির রেলিংটা শক্ত ক'রে ধ'রে রইল।

'আরো কত নেবে?' জিগ্‌গেস করল সুহাস।

'কে নেবে? ও?' খোলা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রমলা।

'না, ও নয়, তুমি।' এক পা এক পা ক'রে এগুতে লাগল সুহাস।

'আমি?' রমলা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

'হ্যাঁ, তুমি। আরো কত নেবে?' রমলার পিঠের পরে সুহাস হাত রাখল: 'কত দয়া, কত ক্ষমা, কত ভালোবাসা?'

শোধ

'কিন্তু আপনার মেয়ে কই ?' জিগ্‌গেস করল রথীন : 'যে প্রার্থী তাকে চাই তো !'

কলেজে সরকারি গ্র্যাণ্ট আছে। মঞ্জুরি আছে ক'টা ফ্রি স্টুডেণ্ট-শিপ। চাই কি সত্যিকার দুস্থ ও গুণী ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে বই-খরিদ বাবদ এক থোকে কিছু টাকা দেবারও ব্যবস্থা আছে।

তেমনি একটা ফ্রি স্টুডেণ্টশিপ চায় তোষিণী। আর সম্ভব হ'লে বই-খরিদ বাবদ থোক একটা টাকা।

সম্ভব হ'লে মানে গুণী হ'লে। তা আপনার মেয়ে তো নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় ভালো ?

ঠিক রত্ন না হ'লেও একেবারে কপর্দকও নয়। তিনবারের চেষ্টায় পাস করেছে। অধ্যবসায়ও তো গুণ।

কিন্তু গুণ দেখলেই কি চলে ? এটা কি গুণের যুগ ? এটা নুনের যুগ। আর চেহারাই হচ্ছে নুন। কিছুই আর তীরে নেই, সব খাতিরে।

ইঙ্গিত যেন তবু বোঝে না যজ্ঞেশ্বর। বলে, 'এই সেই দরখাস্ত। এই তোষিণীর সই।'

'বা, যার দরখাস্ত তাকে একবার দেখতে হবে না ?' রথীন প্রায় রূঢ় হ'য়ে উঠল : 'এ যে তার সই সে সম্বন্ধেও তো নিশ্চিত হ'তে হবে। যদি সনাক্ত করার কথা ওঠে ? তোষিণীকে আনেন নি কেন ?'

'এনেছি।'

'এনেছেন ? কোথায় ?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেই আপনি এসেছেন ভিতরে? কেমনতর মানুষ আপনি ?' দাঁড়িয়ে পড়ল রথীন।

সমস্ত স্নায়ুশিরা কৌতূহলে জাগিয়ে দিতে পেরেছে। শক্ত ক'রে ছিলা বেঁধে ধনুকে এনেছে তীক্ষ্ণতা। এমনি সরাসরি কাছে এসে দাঁড়ালে সাধারণ এক প্রার্থীর মতো দেখত। এখন হয়তো একটু অন্য-রকম দেখবে। হয়তো বা একটু বেশি ক'রে দেখবে।

আগে হ'লে হ'ত চোখ তুলে দেখা। এখন হবে চোখ মেলে দেখা।

'যাই, ডেকে আনছি। বাইরে ঐ গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।' যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে পড়ল।

রথীনও এগিয়ে এল দু পা।

ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

হাতে একখানি খাতার উপর ক'খানি মলাট-দেওয়া বই, গলার নিচে ব্লাউজের প্রান্তে ফাউণ্টেন পেনের ক্লিপ আটকানো, একটি গ্রাম-ঘেঁষা শাদাসিধে মেয়ে। পরনে ময়লা-ময়লা আটপৌরে শাড়ি, পায়ে কাদামাখা স্যাণ্ডেল। দেহখানি দারিদ্র্য ও অযত্ন দিয়ে ঢাকা—মনে হয় এই দারিদ্র্যে আর অযত্নেই সৌষ্ঠব বেড়েছে মেয়েটির। আর যাকে জিজ্ঞাসু হ'য়ে দেখা তাকেই বিস্মিত হ'য়ে দেখা। আহা, এর নামটি রেখেছিল কে ? যে তোষিণী সে কি কখনো বাইরে থাকে ?

'আশ্চর্য ! তুমি বাইরে কেন ? এস ভিতরে।' যজ্ঞেশ্বরের ইঙ্গিত পেলেও যেন রথীনের আহ্বানেরই অপেক্ষা করছিল তোষিণী।

'ওর বড়ো লজ্জা।' পিছন থেকে যজ্ঞেশ্বর বললে।

'লজ্জা করলে কিছু হবে না। নিজেকে জাহির করতে হবে।

নিজের ঢাক পিটতে হবে নিজেকে—' বলতে-বলতে থামল রথীন। মনে হ'ল লজ্জাও কম জাহির করে না, কম তোলে না উচ্চস্বর। আর কিছু সাজগোজ না থাক লজ্জাই সাজগোজ।

এক ফুঁয়ের গলিটা কয়েক পা হেঁটে চাপা হাসির সুগন্ধ ছড়িয়ে উঁচু দুটো সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকল তোষিণী।

'এ তোমার দরখাস্ত? তোমার দস্তখত?' জিগ্‌গেস করল রথীন।

যেন কত তার হাতের লেখা দেখেছে রথীন, এমনি ভাব দেখিয়ে তোষিণী বললে, 'তবে আর কার!'

'তবে তোষিণী বানানে দন্ত্য ন দিয়েছ কেন? যেখানে ঔদ্ধত্য ন্যায্য সেখানে কেন মাথা হেঁট করবে?' রথীন তাকাল চোখের দিকে: 'কেন মাত্রা মেনে চলবে? তোমার দেখি বেশি বিনয়।'

'দিন, ঠিক ক'রে দি।' তোষিণী হাত বাড়াল।

'দরকার নেই। আজকাল বানান-ফানান কেউ দেখে না। হাতের লেখার ছিরিছাঁদও উঠে গেছে। এখন দেখে বক্তব্যে বস্তু আছে কিনা। কি হবে বেশেবাসে, আসলে স্বাস্থ্য আছে কিনা, লাবণ্য আছে কিনা—' রথীন আরো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল দরখাস্ত।

'না, দিন, আপনার কাছেই বা ভুল থাকে কেন?' তোষিণী আরো এক পা এগিয়ে এল টেবিলের কাছে।

'থাক, যখন বলছে লাগবে না—' যজ্ঞেশ্বর বাধা দিল: 'কাটাকুটি হ'লে বরং খারাপ হবে।'

'তোমাকে দেখলাম। তোমাকে চিনলাম। আমার কাছে যখন তুমি সত্য হ'য়েই দেখা দিলে তখন আর ষত্ব-ণত্ব কি?' এবার চোখে একটু গাঢ়তা আনল রথীন: 'তা ছাড়া আমার কাছে থাকলেই না হয় একটু অশুদ্ধ হ'য়ে।'

যেহেতু তারা খুব গরিব, পরপ্রত্যাশী, তারই জন্যে সহসা পারছে এমনি অন্তরঙ্গ হবার সাহস দেখাতে, এমনি মনে হ'ল তোষিণীর। কিন্তু গরিব ব'লে সে হবে না পেছপা। বললে, চোখে সাহসী হাসির রেখা টেনে বললে, 'শুধু আপনার কাছে কোথায়? সমস্ত সংসারের কাছে। দিন, করেক্ট ক'রে দি—'

দরখাস্তসুদ্দু হাত সরিয়ে নিল রথীন। অন্যকথায় এল। বললে, 'কিন্তু আমি সামান্য কেরানি, আমার সাধ্যে কতদূর কি হবে কে জানে!'

'তুমি ভেতরের লোক, তুমি চেষ্টা করলে হবে নিশ্চয়ই।' আশ্বাস দিল যজ্ঞেশ্বর।

'ভেতরের লোক মানে, আফিসের ভেতরে যাতায়াত করি মাত্র। তবে দরখাস্ত ঠিক পৌঁছে দিতে পারব আর কথাটা যাতে আস্তে-আস্তে পৌঁছয় ঠিক কানে তেমনি ভাবে চালিয়ে দিতে পারব আশা করি।'

'তা হ'লেই হবে। তুমি ভেতরের লোক মানে আমাদের সংসারের ভেতরের লোক,' যজ্ঞেশ্বরের চোখ ছলছল ক'রে উঠল: 'আমাদেরই একজন। তোমার বাবা আর আমি—'

'জানি, বন্ধু ছিলেন, পড়তেন এক স্কুলে—'

যজ্ঞেশ্বর চোখ মুছল। বললে, 'ভাগ্যবান ছিল, সব রেখে-ঢেকে গিয়েছে, আর আমি? এখনো প'ড়ে-প'ড়ে মার খাচ্ছি।'

'কিন্তু বাবা যখন অকালে চোখ বোজেন মাকে বললেন, আমার মতো দুঃখী আর হতভাগ্য কে আছে! তোমাকে ফেলে রেখে এ কোথায় চললাম আমি একা-একা,—'

'তবু যেতে যখন হবেই, যে যায় বেশ যায়!' যজ্ঞেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তোমার মা আছেন?'

'হ্যাঁ, উদয়াস্ত ঘানি টানছেন সংসারের।'

'কিন্তু, কেন, বিয়ে করো নি কেন এখনো ?'

বলা উচিত ছিল, কি ক'রে করব, সামান্য কেরানি, অল্প আয়, হাড়গোড়ভাঙা একটা সংসার কাঁধের উপর, ভায়েদের মানুষ করব না নিজে-নিজে অমানুষ বনব— কিন্তু এ সব কিছু না ব'লে উড়ু-উড়ু ভাব ক'রে বললে, 'সময় আসে নি এখনো।'

আর, তুমি তোষিণী, ছাত্রী— না হয় বিচিত্র উদ্যোগ আয়োজন ক'রে ম্যাট্রিকটা পাস করেছ— তাই ব'লে তোমার এ সময়টায় অমনি হঠাৎ চোখ নামিয়ে কোলের উপর দু-হাত জোড় ক'রে স্থির হ'য়ে বসবার মতো কিছু হয় নি। এটা সকাল, বিকেল নয়, সারা শরীরে কনেদেখা আলোর সোনালী আভা আনবার জন্যে লজ্জার রং ফোটাবার কোনো মানে হয় না।

যজ্ঞেশ্বর দার্শনিক হবার চেষ্টায় বললে, 'যা বলেছ। কাল পরিপক্ক না হ'লে কিছুই হবার নয়।'

'আচ্ছা, আমি পেশ করব দরখাস্ত। শুধু সাধ্যমতো নয় সাধ্যাতীত চেষ্টা করব যাতে মঞ্জুর হয়।' দরখাস্তটা ভাঁজ ক'রে ব্লটিং প্যাডের তলায় রেখে দিল রথীন।

'বুঝতেই তো পারছ। যদি পড়াশোনা ক'রে পাস-টাস না করতে পারে তা হ'লে কি ক'রে ছোটোখাটো একটা চাকরি জোটে বলো ?'

'ছোটোখাটো কেন, বড়ো চাকরিও জুটে যেতে পারে—' ভবিষ্যদ্বক্তা হবার ভান করতে রথীনেরও বা আপত্তি কি।

'আমাদের অদৃষ্টে আবার ঘাস হ'য়ে চন্দ্রমল্লিকা!' ভেবেছিল কথার পিঠে যজ্ঞেশ্বরই বলবে কিন্তু, না, তাকিয়ে দেখল, কথাটা বলেছে

তোষিণী আর শরীরে এমন একটা গাঢ়পুষ্ট ভঙ্গি ক'রে উঠেছে যে ঘাস যেই হোক, সেই চন্দ্রমল্লিকা!

ক'দিন পরে তোষিণী নিজেই এসেছে খোঁজ নিতে। সঙ্গে ছোটো ভাই অনাথ।

'এ কি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' অফিসফেরত রথীন গলির মুখে দেখতে পেল দু-জনকে।

'আপনি তো নেই—' হাসি মুখে বললে তোষিণী।

'ভিতরে নিয়ে যাবার লোক না এলে বুঝি ঢুকতে পারো না? এস।'

ঘরটা আজ একটু সজাগ চোখে দেখল তোষিণী। সদর রাস্তা থেকে চিলতে যে গলিটা বেরিয়ে এসেছে তার খানিকটা পার হ'য়ে প্রথম ঘরটাই রথীনের। তার গা বেয়ে খালি বারান্দাটা পেরোলেই পিছনে বাকি মানুষের আস্তানা। শোয়া-বসা লেখাপড়া সাজাগোজা সব কিছুই এই এক ঘরে। জানলা আছে শিয়রের দিকে। দরজায় চিঠি ফেলবার ফাঁক। কড়া আছে একজোড়া।

'ওঠো, খাটের উপর বোসো পা ঝুলিয়ে!' বললে রথীন। অনাথের দিকে চোখ বটে কিন্তু লক্ষ্য তোষিণী।

আগের দিন যেন একটা কাঠের সরু বেঞ্চি ছিল ঘরে। সেটা বুঝি কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হয়েছে। ওরকম একটা নিচু আসনে বসবার ভঙ্গিটাই বুঝি সমীচীন হ'ত, স্বাভাবিক হ'ত। খাটটা এত বিশ্রী উঁচু, পা মেঝে ছোঁবে না, কদাকারের মতো ঝুলবে।

'বসবার কি দরকার!'

'বা, তা কি হয়? ভদ্রলোকের ঘরে বসতে জায়গা পর্যন্ত দিলে না, লোকে শুনলে বলবে কি!'

'প্রশংসা করবে। ভালো বলবে।' হাসল তোষিণী : 'বলবে, ভালোই করেছে, প্রশ্রয় দেয় নি। নইলে কে না জানে, বসতে পেলে শুতে চায়।' কথাটা ব'লে ফেলেই মরমে ম্লান হ'য়ে গেল তোষিণী। ছি ছি, এটা কি ব'লে ফেললাম! তাড়াতাড়ি স্বর পালটে জিগগেস করলে, 'বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। খবর কিছু আছে কিনা তাই বলুন।'

খবর ভালো নয়, তাই তো এত উপশমের ব্যবস্থা।

'তা কি হয়?' পাশ কাটাতে চাইল রথীন : 'চেয়ারটায় বোসো।'

ঘরে একখানা মাত্র চেয়ার, ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে তোষিণী চেয়ারে বসবে এটা অশালীন। আর অনাথ? অনাথ দাঁড়িয়ে থাকবে? এটা অন্যায়।

'একটা মাদুর-টাদুর দিন না পেতে—'

যে একখানা মাদুর পাতা হ'ল তাতে আগেই ব'সে পড়ল অনাথ। ক্ষিপ্র আঙুলে জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে, 'বাবাঃ, কত যে হেঁটেছি আজ, আর পারছি না দাঁড়াতে—'

'কেন, হাঁটলে কেন?'

'বাড়ি খুঁজে কি বার করতে পারি? দিদিটা একবার এসে গেছে তবু কিছু খেয়াল নেই।' জুতোর ফিতে খুলে ফেলে দু পা টান করল অনাথ।

অনাথের বসবার পর বাকি যে জায়গাটুকু আছে তাতে বসতে গেলে আদ্ধেক পা বাইরে থাকবে আর সে পা দুটোকে বাঁচাতে গেলে হাঁটু ভেঙে বসবার এমন একটা বিহ্বল ভঙ্গি করতে হবে যেটা অসংগত।

'আচ্ছা, খাটেই বসছি।' দু হাতের ভর রেখে পিছন দিক থেকে লাফিয়ে উঠল তোষিণী।

'পা তুলে বোসো বাবু হ'য়ে—'

'আপনারই বা খাট সম্বন্ধে এত বাবুয়ানা কেন?' কথার পিঠে অবান্তর কথা এসে যাচ্ছে তোষিণীর: 'এত উঁচু করবার কী হয়েছে?'

'খাটের নিচে জিনিসের টাল দেখেছ? সাধে কি আর উঁচু হয়েছি? ঠেলার চোটে উঁচু হওয়ায়। তুমিও যদি অনুরোধে একটু উঁচু হও, পা তুলে বোসো- -'

'বাবাঃ, পারব না এত।' নেমে পড়ল তোষিণী। বললে, 'এই সবে আপনি আফিস থেকে এসেছেন। এখন বেশি বিরক্ত ক'রে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করব না- '

'তুমি জানো না বুঝি? বিরক্তিই মাঝে-মাঝে বিশ্রাম।'

'সেটা আপনি ভদ্রতা ক'রে বলছেন। কিন্তু কি দরকার উপস্থিতিকে দীর্ঘ ক'রে? বিষয়টা তো সামান্য।'

'সামান্য?'

'মানে, আপনার উত্তরটা। কি, কিছু আশা আছে?'

'কিসের?' তবু একটু ঘোরাতে চাইল রথীন।

'আমার দরখাস্তের। কি, আছে আশা?' তোষিণী চোখের কোণটা তীক্ষ্ণ করল।

'ভদ্রতা ক'রে বলব?'

হাসল তোষিণী। 'আপনি অন্য রকম ক'রে পারেন নাকি বলতে?'

সত্যিই পারল না। বললে, 'হ্যাঁ, আশা আছে বৈ কি।'

'সংসারে সর্বত্রই আশা আছে সেই আশা নয়—'

'না, না, ধূসর অস্পষ্ট কিছু নয়। সব হ'য়ে গিয়েছে, সেক্রেটারির শুধু সই করতে বাকি। ক'দিন পরে আমি নিজেই যাব তোমাদের বাড়ি। অর্ডারটা নিয়ে যাব।'

'যাবেন ?'

যেন এখুনি তার জন্যে ঘরদোর প্রস্তুত করা দরকার তেমনি ত্বরা দেখিয়ে তোষিণী বললে, 'নে, ওঠ অনাথ, বাড়ি চল—'

অনাথ হতাশ মুখে জুতো প'রে ফিতে বাঁধতে শুরু করল।

খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে এল রথীন।

'এ কি, আপনি আসছেন কষ্ট ক'রে ?'

'পথে একসঙ্গে কয়েক পা না হাঁটলে কি বন্ধু হওয়া যায় ?'

'বা, এইমাত্র আপনি ফিরলেন খেটেখুটে—'

'কই ফিরলাম! আমি ফিরি নি এখনো। চলো, মোড় পর্যন্ত গিয়ে তোমাদের ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।' সদাশিবের মতো বললে রথীন।

'ট্রামে যাব না আমরা।' অনাথ বললে।

'তবে ? বাসে ? বাস তোমাদের কলোনি পর্যন্তই যায় বুঝি।'

'না, বাসেও নয়।'

'তবে ?' ট্যাক্সি বলতে সাহস হচ্ছে না রথীনের। না বা অনাথের।

অনাথ ঢোক গিলল, বললে, 'আমাদের বাস-ট্রামের পয়সা নেই—'

'সে কি ?' থমকে পড়ল রথীন।

'না, না, আছে।' ধমকের সুরে তোষিণী রুখে উঠল: 'আমার কাছে আছে।'

'ছাই আছে। যা আছে তা দিয়ে টালিগঞ্জ ট্রামডিপো থেকে হবে।' বললে অনাথ, 'এখন ডিপো পর্যন্ত হাঁটো নিশ্চিন্ত হ'য়ে। আসবার সময়ও সেই ব্যবস্থা ছিল ব'লে এত মেহনত, তারপর দিদির ভুলের জন্যে রাস্তায় ঘুরপাক—'

মনিব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বের করল রথীন।

তোষিণীর হাতের মধ্যে গুঁজে দেবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কেন হাঁটবে? সটান বাসে ক'রে চ'লে যাও।'

যেন সাপে কেটেছে এমনি আতঙ্কে সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ ক'রে উঠল তোষিণী। সারা শরীরে প্রতিবাদের ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'না, না, ছি, ছি, ও কি—'

হাত গুটিয়ে নিল রথীন। অভিমানমাখা মুখে বললে, 'এ তো আর কিছু নয়, সামান্য বাসভাড়া। এতে এত ক্রুদ্ধ হবার কি হয়েছে?'

কথা বলল না তোষিণী। বড়ো-বড়ো পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। কতদূর গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'যাবেন কিন্তু একদিন।'

ক'দিন পরেই রথীন উপস্থিত।

কিন্তু এ কি বাড়িঘর! অন্ধকার বস্তির মধ্যে ভাঙা টিনের চালে দু-কুঠুরির একটা অন্ধকূপ বললেও খাতির করা হয়— একটা এঁদো কুয়ো। ইটের দেয়াল বটে কিন্তু কোথাও এতটুকু চুনের পোঁচড়া নেই। ছেঁড়া চটের গোছলা জানলা-দরজার বদলি খাটছে। মেঝের উপর বৃষ্টির জল ধরবার জন্যে থাকিয়ে বালতি বসানো। চারদিকে আগাছা-জঙ্গলের জটলা।

'দেখুন কি ভাবে আছি।' ছেঁড়া শাড়িব আঁচল গায়ের উপর টেনে তোষিণী বললে।

'তোমার কি ভাবনা!' রথীন হালকা সুরে বললে, 'তুমি আর কতদিন থাকবে! মেয়েরা কতদিন থাকে!'

'তার মানে?'

'তুমি তো অন্য ঘরের জন্যে তৈরি, অন্য ঘাটের। তোমার কি ভাবনা!' আঁচল নিয়ে শত নাড়াচাড়া ক'রেও রিক্ত বাহু দুটি ঢাকতে

পারছে না তোষিণী। সেই দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল রথীন, জিগ্‌গেস করল, 'খুব গরম হয় বুঝি ঘরে ?'

'শুধু গরম ? বৃষ্টি নয় ?' অকৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে কপট হাসি মেশাল তোষিণী : 'বৃষ্টির শব্দ নিয়ে কত কবিত্ব শুনি। কিন্তু যখন টিনের চালের পরে পড়ে, উঃ, সে কী ভীষণ যন্ত্রণা, শান্তি সুখ সব জ্ব'লে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। যাক, আসল খবর বলুন। কিছু হ'ল ?'

'তোমার বাবা কোথায় ?'

'দোকানে। ঐ একখানা মনিহারি দোকানই সমস্ত সংসারের পাকস্থলী।'

'তোমার মা কোথায় ?'

'যখন সবাইকে ডাকছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।' মাকে ডেকে দিয়ে তোষিণী চ'লে গেল পাশের ঘরে।

অনেক ঝড়ে প'ড়েও সামলেছে যে নৌকো তেমনি একটা দাগধরা শক্ত চেহারার মানুষ এই নয়নতারা।

'কিছু হ'ল সুবিধে ?' গৌরচন্দ্রিকা না ভেঙ্গে জিগ্‌গেস করল সরাসরি।

আগে থেকেই ঠিক ক'রে এসেছে রথীন। তার পক্ষে মাস-মাস টাকা দেওয়া কঠিন, তাতে ধরা পড়ারও সম্ভাবনা। বরং এক থোকে কষ্টেস্বষ্টে দিয়ে দেওয়া যায় একবার।

'ফ্রি স্টুডেন্টশিপটা হ'ল না, তবে বই কেনা বাবদ এক থোকে পঁচিশ টাকা দিয়েছে।' ব'লে পকেট থেকে টাকা বের করল রথীন।

'যা পাওয়া যায় তাই লাভ!' হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল নয়নতারা।

'ছাই লাভ।' পাশের ঘর থেকে জামা গায়ে দিয়ে চ'লে এসেছে তোষিণী। ঘাড়ের ঝাড়া দিয়ে মাথার চুল ছড়িয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললে,

'আসল হচ্ছে মাস-মাইনেটা না লাগা। যারা বই কিনতে টাকা দিতে পারে মাস-মাইনেটা ফ্রি ক'রে দিতে পারে না? শুধু বই কিনে কি হবে? ঘোড়া নেই শুধু চাবুকের বাহার।'

'তবু নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা মন্দ কি।' টাকাটা আঁচলে বাঁধল নয়নতারা।

অন্ধকার আনাচকানাচ দিয়ে একটু এগিয়ে দিতে এল তোষিণী। বলল, 'মাস-মাস মাইনে যোগাতে না পারলে চালাব কি ক'রে? শুধু মেঘেই কি মাটি ভেজে? এমন কিছু কি ব্যবস্থা হয় না?'

'হয়।' দিব্যি ব'লে ফেলল রথীন।

'হয়?' উছলে উঠল তোষিণী: 'কি ভাবে?'

'দেখি, চাকরি একটা যোগাড় হয় কিনা কোথাও।' রথীন টালটা সামলে নিল।

'হ্যাঁ, যে কোনো একটা চাকরি। অন্তত একটা দাসীবৃত্তি।' তোষিণীর গলায় ঝ'রে পড়ল কাকুতি: 'আর এ ভাবে চলে না। সইতে পারি না বইতে পারি না দুর্দশা।'

'জানো যে রানী সেও একজনের দাসী, আর যে দাসী সেও একজনের রানী।' কণ্ঠস্বর ভরাট করল রথীন।

'জানি। কিন্তু বইয়ের কথা বইয়ে থাক। আমার তো শুধু বই কেনবার কথা, পড়বার নয়।' অন্ধকারেই ফিরে গেল তোষিণী।

সটান ডিরেক্টরেটে চিঠি লিখল। বই কিনতে তো টাকা মঞ্জুর করলেন কিন্তু পড়ব কি ক'রে যদি কলেজের মাস-মাইনে না মকুব হয়? থালাভরা ভাত দিলেন কিন্তু নুনটুকু কই?

ডিরেক্টরেট উত্তর পাঠাল, স্বপ্ন দেখেছেন আপনি। আপনাকে বই কেনবার টাকাও মঞ্জুর করা হয় নি।

সত্যিই তো, তখন থেকে ভাবছে রথীন, মাস-মাস মাইনের ব্যবস্থা না হ'লে পড়ে কি ক'রে? শুধু বই দিয়ে কি হবে? শুধু কাজল দিয়ে কি হবে যদি চোখে না চাউনি থাকে?

অন্তত হাফ-ফ্রি তো রথীনই ক'রে দিতে পারে। হাফ-ফ্রি মানে মাসে সাত টাকা। না হয় দিলই বা সাত টাকা। আরেকটা না হয় টিউশনি নেবে সকালের দিকে।

অপঠিত বই আর অজ্বলিত অন্ধকার দুই-ই নিরর্থকতায় দুঃসহ।

সেই কথাটাই বলতে এসেছিল রথীন, তোষিণী যেন ওত পেতে ছিল বাঘের মতো। বললে, 'মা, এসেছে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।'

'হ্যাঁ, বাবা, তোমার টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

'কিসের টাকা?' পেটের কথা মুখের মধ্যে আটকে রেখে পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রথীন।

'যে পঁচিশ টাকা বই কেনা বাবদ তুমি দিয়ে গিয়েছিলে সেদিন—' আঁচলের গিঁট খুলতে লাগল নয়নতারা।

'সে কি?'

'যা প্রাপ্য নয় যা শুধু দান তা আমরা পারব না নিতে।' নয়নতারা মুখচোখ গম্ভীর করল। তাকাল মেয়ের দিকে। পার্টটা ঠিক মতো বলতে পারছে কি না মুখস্থ, যেন তারই সমর্থন খুঁজল।

'আহা সরকারের থেকে যেটা নিতে চেয়েছিলে সেটা কি দান নয়? সেটা কি সরকারের ঘরে প্রাপ্য তোমাদের? দাদন দেওয়া?' আজ বাড়িতে ছিল যজ্ঞেশ্বর, হাঁকার দিয়ে উঠল। রথীনের পিঠে হাত রেখে বললে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। ও টাকা নেবে না তুমি ফিরিয়ে, কিছুতে না। ও এখন আমার সংসারের টাকা।'

'না। দুঃখে দারিদ্র্যে দিন যাচ্ছে বটে তবু পারব না ভিক্ষে নিতে।'

মেয়ের দৃষ্টির উত্তাপে আশ্বাস নিয়ে আবার বললে নয়নতারা। আঁচলের গ্রন্থি থেকে ঠিক বার করল টাকা ক'টা।

আশ্চর্য, দুঃখে কষ্টে অভাবেও তখুনি-তখুনি টাকাটা ব্যয় হয় নি। যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে মায়ে-ঝিয়ে। আগে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছে টাকাটা ঠিক হকের কিনা, সত্যের কিনা— শুদ্ধের কিনা। আশ্চর্য, এখনো এত সূক্ষ্ম হিসেব! নাচতে নেমে ঘোমটা!

এই নিয়ে তুমুল হ'য়ে গেল। একদিকে যজ্ঞেশ্বর, আরেক দিকে মা-মেয়ে। যজ্ঞেশ্বর বলছে, রথীন আমাদের আপনার লোক, তাই তো ওর কাছে আমাদের যাওয়া। ও যদি সাহায্য করে, দরখাস্ত আফিসে পৌঁছে দিয়ে তদবির করাও সাহায্য, তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই, থাকতে পারে না।

না, আমরা ওঁর কাছে সাহায্য চাইতে পারি কিন্তু ভিক্ষে চাই নি। তা ছাড়া সে সাহায্যের সীমা-সংজ্ঞা নির্দিষ্ট ছিল। এ জবাব মা-মেয়ের। তা ছাড়া উনি যা ভিক্ষে স্বরূপ দিচ্ছেন তার মধ্যে মিথ্যে মিশিয়েছেন, ছলনা মিশিয়েছেন—

'যে টাকার মধ্যে মিথ্যে মেশানো আছে,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এবার স্পষ্ট উচ্চারণ করল তোষিণী : 'তার মধ্যে অপমানের ধুলো।'

'দিন টাকাটা—' টাকাটা নয়নতারার হাত থেকে তুলে নিয়ে ফিরে চলল রথীন।

'চললেন ?' অন্ধকারে পিছন থেকে ডাকল তোষিণী।

রথীন দাঁড়াল। তোষিণী কোথায় ? অন্ধকারই কথা ক'য়ে উঠল বোধ হয়।

'আপনার টাকা ফেরত দিলাম বটে কিন্তু আপনাকে নয়।'

'তার মানে ?' রথীন অন্ধকারকেই সম্ভাষণ করল।

'তার মানে আবার আসবেন।'

আবার গেল রথীন। আর এবার সরাসরি টাকা চাইল।

গঙ্গাসাগরের মেলায় স্টল তোলার টেণ্ডার চেয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। যদি কিছু টাকা পাই কন্‌ট্রাক্টটা নিতে পারি। তা হ'লে সংসারটা আবার হালে পানি পায়।

'কত টাকা?' দিব্যি জিগ্‌গেস করল রথীন।

'এই শ' চারেক। তুমি দিতে পারো?' যজ্ঞেশ্বর রথীনের হাত চেপে ধরল।

নয়নতারা আর তোষিণী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, ভাগ্যিস দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে চেয়ে রথীন জিগ্‌গেস করল, 'কি, দিতে পারি টাকা?'

এতটুকু নড়ল না তোষিণী। বললে, 'হ্যাঁ, পারেন, অনায়াসে পারেন, কেননা এটা আপনি ধার দেবেন বাবাকে, ভিক্ষে দেবেন না।'

'হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড টাকাটা দিয়ে দিলেই ফেরত দিয়ে দেব তক্ষুনি।' যজ্ঞেশ্বর সরল স্বরে বললে।

'কিন্তু আমার ক্ষমতা কই?' পাশ কাটাতে চাইল রথীন।

'মোটে চারশ' তো টাকা, দিন না কোত্থেকে যোগাড় ক'রে।' দস্তুরমতো অনুনয়ের স্বর আনল তোষিণী: 'দেখছেন তো আমাদের অবস্থা। পড়া বন্ধ করতে হ'ল। চাকরি জুটল না একটাও—'

পোস্টাফিসের বই থেকে জমানো টাকা তুলল রথীন। ফাঁকায়-ফাঁকায় নিতে চেয়েছিল যজ্ঞেশ্বর। রথীন বললে, 'না, যান, আপনার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসব।'

'হ্যাণ্ডনোট করবে নাকি?'

'না, তার দরকার হবে না।'

যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে গিয়ে নয়নতারা ও তোষিণীর সামনে গুনে-গুনে টাকা দিল রথীন। চাক্ষুষ সাক্ষী রইল দু-জনে। সত্যের ঘরের বাসিন্দে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। নিশ্চিন্ত হ'ল রথীন। তবু যদি এদের অবস্থাটা একটু ফেরে। দিন-রাত্রির পৃষ্ঠাগুলি একটু উজ্জ্বল হয়। শাড়িটা আস্ত-মস্ত হয় তোষিণীর। অনাথের জুতোতে মুচির হাত পড়ে।

'টাকা আপনার খুব বেশি হয়েছে?' অন্ধকারে আবার ডাক দিল তোষিণী।

'কোত্থেকে হবে? কত কষ্টে জমানো টাকা—'

'তাই আপনি জলে ফেলবেন?'

'বা, তুমিই তো বললে দিতে—'

'আমি বললাম ব'লেই আপনি দেবেন? আমি তো কত কিছুই বলতে পারি। আমি যদি বলি—' একটু কি দ্বিধায় জড়িয়ে গেল তোষিণী?

'কি, বলো না, ব'লেই দেখ না—' রথীন উচ্ছ্বসিত হ'তে চাইল।

'আমি বলতে যাব কেন? সব আমাকেই বলতে হবে?'

হাত বাড়াল রথীন। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই হাতে পেল না।

'মেলা শেষ হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কবে মঞ্জুর ক'রে দিয়েছে টাকা। এখন আমারটা ফেরত দিন।' হাত পাতল রথীন।

যজ্ঞেশ্বর বললে, 'টাকাটা এখনো পাই নি। পেলেই দিয়ে দেব।'

'লোকে অনেক কিছু বলবে কিন্তু আর যাই ছাড়ুন না ছাড়ুন, টাকা আপনি ছাড়বেন না কিন্তু।' কানে-কানে বলার মতো ক'রে বললে তোষিণী।

'বা, হকের জিনিস সত্যের জিনিস ছাড়ব কেন?' রথীন বললে।

'কখনো না। দেড়েমুষে আদায় করবেন। সুদ চাইবেন।' তর্জনী নেড়ে কথাটাকে জোরালো করল তোষিণী।

'সুদের চুক্তি তো করি নি।'

'সব চাওয়াই বুঝি চুক্তি মেনে চলে? চুক্তির বাইরেও অনেক কিছু ফাউ থাকে। কখনো-কখনো আসলের চেয়ে সুদ বড়ো। মূলের চেয়ে ফাউ।'

একদৃষ্টে তোষিণীর দিকে তাকিয়ে রইল রথীন।

'চাইবেন, জোর ক'রে চাইবেন। থাবা মেলে চাইবেন।' আবার বললে তোষিণী : 'শুধু চাওয়ার জোরেই পাওয়া।'

বারে-বারে এসে তাগাদা করছে রথীন। পাই নি ব'লে আর ঠেকাতে পারছে না যজ্ঞেশ্বর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে অকাট্য প্রমাণ এনেছে, টাকা পেমেণ্ট হ'য়ে গিয়েছে। আর পাশ কাটাবার পথ নেই। তবে দিয়ে দিন, ফেলে দিন—

এবার আমতা-আমতা ধরল যজ্ঞেশ্বর। টালবাহানা শুরু করল। আজ নয় কাল, কাল নয় এক হপ্তা, এক হপ্তা নয় এক মাস।

'অসম্ভব।' আবার কাছে এসে নিরিবিলিতে দাঁড়াল তোষিণী : 'আপনি কি মানুষ?'

থামল রথীন।

'কি ক'রে চাইতে হয় আদায় করতে হয় জানেন না কিছু?'

'কি ক'রে?' সত্যিই জানে না এমনি রথীন মুখ করল।

'স্রেফ গায়ের জোরে। আপনার কি একটুও জোর নেই, সাহস নেই?' তোষিণী যেন আরও একটু ঘেঁষে এল : 'যা আপনার প্রাপ্য তাকে ধরতে পারেন না আঁকড়ে? মুঠো চেপে?'

না, জোরই দেখাবে রথীন।

সেদিন স্পষ্টাস্পষ্টি মুখিয়ে এল। একেবারে যজ্ঞেশ্বরের বুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। যেন পিস্তল উঁচিয়েছে এমনি ভাবে বললে, 'টাকাটা আজই দিয়ে দিন। এই মুহূর্তে।'

আর যেন অন্য কিছু বলবার নেই, উপায়ান্তর নেই আত্মরক্ষার। যজ্ঞেশ্বর বললে, 'টাকা, কিসের টাকা? কে তোমার টাকা নিয়েছে?'

'সে কি?' পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল নয়নতারা।

এ প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করল না যজ্ঞেশ্বর। বললে, 'বাজে কথা বলবার আর তুমি জায়গা পাও নি? টাকা, টাকা, টাকা নিয়েছি লেখা আছে কোথাও? দলিল ছাড়া টাকা দেয় কেউ ইহকালে?'

'বা, টাকা তুমি নিয়েছ বাবা।' তোষিণী বললে তেজী গলায়।

'নিয়েছি?' ছুটে গিয়ে মেয়ের গালে এক চড় কশাল যজ্ঞেশ্বর। 'তুই দেখেছিস নিতে?'

'বা, কে না জানে নিয়েছ টাকা।' জোরী গলায় বললে নয়নতারা: 'শুধু-শুধু মেয়েটাকে মেরে লাভ কি?'

'বেশ করেছি নিয়েছি।' যজ্ঞেশ্বর মুখ-চোখ হিংস্র ক'রে বললে, 'আর এও জানি কেন নিয়েছি। কিসের দাদন এ টাকা। এ টাকার ফেরত নেই, এ হয় না ফেরত।'

'এ অপমান আপনি সহ্য করবেন না।' মারখাওয়া মুখে বললে তোষিণী: 'এর আপনি প্রতিশোধ নেবেন। ছাড়বেন না আপনার দাবি, আপনার আসল-- আপনার আসল--'

মামলা ঠুকল রথীন। আর্জিতে লিখল, দলিল-মুচলেকা নেই, শুধু মোকাবিলা সাক্ষী আছে। সাক্ষীর মধ্যে আর কেউ নয়, স্বয়ং বিবাদীর স্ত্রী নয়নতারা আর মেয়ে তোষিণী। তাদের সামনে টাকা দিয়েছি।

তারা দেখেছে টাকা দেওয়া। যাদেরকে সাক্ষী মেনেছি আদালতের পেয়াদাযোগে সমন দেওয়া হোক তাদের।

জবাবে লিখল যজ্ঞেশ্বর— দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যে, ভাক্ত। বই কিনে দেবে, কলেজে বিনে মাইনে ক'রে দেবে এ সব ছুতো ক'রে আমার মেয়ের সঙ্গে মেশামেশি করতে চাইত, বাধা দিয়েছি ব'লে এই মিথ্যে মকদ্দমা করেছে।

মামলার ডাক পডল। প্রথমেই জবানবন্দি হ'ল রথীনের।

তারপরে ডাক পড়ল প্রথম সাক্ষী নয়নতারার।

'আপনার স্বামী টাকা ধার নিয়েছে রথীনের থেকে ?'

'না।'

'না ?'

'না, মামলা মিথ্যে।' স্পষ্ট বলল নয়নতারা।

এবার দ্বিতীয় সাক্ষী তোষিণী।

'আপনার বাবাকে টাকা ধার দিয়েছে রথীন ?'

'দিয়েছে।'

'তুমি দেখেছ ?'

'দেখেছি। আমার সামনেই দিয়েছে।'

'কত টাকা ?'

'চারশ'।'

অনেক জেরা করল যজ্ঞেশ্বরের উকিল। একচুল টলাতে পারল না। গলায় আনতে পারল না এক তন্তু কুয়াশা।

উকিল সওয়াল করল, মামলা ডিক্রি হওয়া উচিত। একমাত্র তোষিণীর সাক্ষ্যে। সাধ্বী স্ত্রী নয়নতারা স্বামীর পক্ষ নেবে এ আর বিচিত্র কি।

অন্য পক্ষ পালটা বলল, মামলা ডিসমিস হবে। নয়নতারা যদি স্ত্রী হ'য়ে যজ্ঞেশ্বরের দিকে হেলে থাকে, অনুরূপ কারণে তোষিণীও হেলেছে রথীনের দিকে। সুতরাং ও সাক্ষ্যের মূল্য নেই। নয়নতারা আর তোষিণী যদি কাটাকাটি যায় তা হ'লে বাকি থাকে 'ওথ্ ভর্সাস ওথ্'। দলিল নেই দস্তাবেজ নেই নিরপেক্ষ সাক্ষী নেই— মামলা ডিসমিস।

ছোটো আদালতের মামলা, দু-কলম তক্ষুনি লিখে হাকিম মামলা ডিসমিস ক'রে দিলেন। এ মামলাতে বস্তু নেই শুধু আশনাইয়ের রোশনাই।

রায় পেয়ে উদ্দাম হ'য়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর। বারান্দাতেই এক চড় কশাল তোষিণীকে। হারামজাদি—

ঠিক রথীনের চোখের উপর কান্না ভর-ভর চোখ ফেলল তোষিণী: 'এই অপমানের তুমি শোধ তুলবে না? আজও না, এখনো না? সত্যকে এমনি ক'রে হেরে যেতে দেবে? তোমার জন্যে সকলের সামনে এই লাঞ্ছনা সওয়া ব্যর্থ ক'রে দেবে?' আদালতের ভিড়ের বাইরে ঠিক গাছতলায় একা-একা ধরতে পেরেছে রথীনকে: 'টাকার শোধ টাকায় হয়, মারের শোধ কি তেমনি মারে? সম্মান দিয়ে অপমানের শোধ হয় না? ত্যাগ দিয়ে লোভের?'

ছোটো আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল নেই— কি প্রতিকার, সন্ধ্যা-পেরোনো রাত্রে, শোব-শোব করছে, ভাবছে রথীন। গলিরাস্তা নিঝুম হয়েছে কখন। দূরে-দূরে শুধু দু-একটা রিক্শার ঠুনঠুন।

কে যেন কাকে ঠেলে দিচ্ছে বাড়িতে। বলছে, 'এবার চিনেছিস? যা এবার, ঐ বাড়ি—'

দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল।

'কে?' রথীন খুলে দিল দরজা।

'এ কি, তোষিণী ? এই রাতে ? একা এসেছ ?'

'হ্যাঁ—'

'একা ?'

তাড়াতাড়ি গলিতে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রথীন। দেখতে পেল বড়ো-বড়ো পা ফেলে চ'লে যাচ্ছে যজ্ঞেশ্বর।

তাড়াতাড়ি ফিরে এল রথীন। বাইরে আলোয় দাঁড়িয়ে আছে তোষিণী। বললে, 'তোমার বাবাকে ডাকো। নইলে কার সঙ্গে ফিরবে ? তিনি যান নি এখনো বেশি দূর— ধরো গে পা চালিয়ে—'

দরজা বন্ধ ক'রে দিল রথীন।

শ্রে য় সী

কি মজা! তুমি এখানেই বদলি হ'য়ে আসছ। এ একেবারে ধারণার অতীত। লিভ ভেকেন্সি না নতুন পোস্টিং?

কবে আসছ? ফুল জয়েনিং টাইম এভেইল করবে নাকি? কি দরকার! ফার্নিচার বাসনকোসন তো সব এখানে। একলা মানুষ, মালপত্র তো বেশি হবার কথা নয়। বাঁধাছাঁদা একবেলার ব্যাপার। তাই যত শিগগির সম্ভব চ'লে এস। হাতে জয়েনিং টাইম থাকে এখানেই কাটাবে শুয়ে ব'সে। না হয় বাড়ি খুঁজে। তখন কি তাড়াটাই গেল!

সম্প্রতি এ-বাড়িতেই উঠবে বাবা ব'লে দিলেন। তড়িঘড়ি বাড়ি যে পাবে এমন মনে হয় না। যদি কারু লিভ ভেকেন্সিতে এসে থাকো, সে নিজে সরলেও ফ্যামিলি সরাবে না। আর যদি নতুন পোস্টিং হয়, বাড়ি তো নয় আকাশকুসুম।

কবে আসছ টেলিগ্রাম ক'রে জানিও। ইতি তোমার পূরবী।

এর বেশি চাঞ্চল্য নেই। একটা কি যেন ডাকনাম শুনেছিল, কুলু না বুলু, ঠিক মনে পড়ছে না। কুলুই হবে হয়তো। ইতিতে লিখলেই দিব্যি জানা যেত ঠিকঠাক। কিন্তু ইতিতে ডাকনাম লিখলে হালকা শোনাত নিশ্চয়ই, একটু বা অশালীন। তা ছাড়া ডাকনাম মাত্রই বিচ্ছিরি।

ডাকনাম ডাকনাম। তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। একটু আদর-ভালোবাসার সুর মিশিয়ে ডাকার জন্যেই ডাকনাম। কুলু,

নদীর কুলুকুলু। খুব রেগে উঠলে কুলি ব'লে কোন না ডেকেছে কেউ মাঝে-মাঝে। তার বদলে পূরবী। কেমন যেন আঁটসাঁট জামাপরা, স্ট্র্যাপ বাঁধা জুতো পায়ে দেখতে।

নামের শেষে ফলাও ক'রে পদবী ও ডিগ্রিটা যে লেখে নি তাই ঢের। তা হ'লে একেবারে কাঁধে নিশান নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মিছিলে।

না, দ্বিতীয়বার প'ড়ে আবিষ্কার করল সুখেন্দু, 'তোমার'টি আছে।

জামায় বোতামের ঘর আছে। দেয়ালে ঘুলঘুলি। কাঠের মধ্যে কোথাও একটু চিনির বাসা।

তৃতীয়বার পড়বার মতন নয়। রেখে দিল চিঠিটা।

আরো একটা আছে। নাজিরের চিঠি। বাসা একটা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। যার জায়গায় আপনি আসছেন, ভাড়াটে বাড়ি, তিনি ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন কিনা ঠিক করেন নি। যদি নিয়ে যান এ-বাড়িতেই উঠতে পারবেন। নচেৎ অন্য বাড়ি দেখতে হবে। দেখছি। লোক লাগিয়েছি। দু-চার দিনের মধ্যেই একটা হিল্লে করতে পারব আশা করি। সে ক'টা দিন এখানে, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার আত্মীয়ের বাসায়ই থাকতে পারবেন। নচেৎ যদি বলেন, ডাকবাংলো ঠিক রাখব।

এটা বেশ উৎসাহদায়ক চিঠি। এতটা যেন আশা করা যেত না। স্বাধীনতার পর পরোপকার করা উঠে গেছে। সবাই স্বাধীন। পিওন-চাপরাসিও স্বাধীন।

কি জানি কেন, আরেকবার পূরবীর চিঠিটা টেনে নিল সুখেন্দু। গোড়াতেই একটা মজার কথা লিখেছে না? তা ছাড়া এটা—টেলিগ্রাম ক'রে জানাও কবে আসছ। এর মধ্যে নেই কি একটু ব্যাকুলতার সুর? কোমলতার সুর?

হাতের স্পর্শটা মনে পড়ল। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম আসছে না। কি ক'রে আসে। পাশে যদি একজন ভদ্রমহিলা শুয়ে থাকেন, তা হ'লে শান্তি কই ? জেগে থেকে অন্তত সম্ভ্রমকে তো পাহারা দিতে হবে। তা ছাড়া ভদ্রভাবে কি ব'লে আরম্ভ করতে হয় কথা তাও জানা নেই।

অন্ধকার ঘরে ভাগ্যিস ফ্যানটা স্পার্ক দিচ্ছিল। একটু ভয়মেশানো স্বরে সুখেন্দু তাই বলতে পারল : 'ফ্যানটা জ'লে যাবে না তো ?'

ফ্যান আবার কি ক'রে জলে। ব'লে ফেলেই একটু ঘাবড়েছিল। বিজ্ঞানের মেয়ে, খুব ঠিকঠাক কথা বলা দরকার।

তোমাদের বাড়ির ফ্যান তোমরাই জানো—এ অনায়াসে বলতে পারত পূরবী। তা হ'লে বলাটা বরং অনৈর্ব্যক্তিক হ'ত। তা না ব'লে বললে, 'বন্ধ ক'রে দিলে কেমন হয় ?'

তোমার হাতের কাছেই সুইচ, দয়া ক'রে একটু উঠে বন্ধ ক'রে দাও না—এ বললে কি খুব অসমীচীন হ'ত ? বললে বরং একটু আপনঘেঁষা শোনাত। তার বদলে সুখেন্দু বললে, 'ওরে বাবা, বন্ধ করলে ঘুমুব কি ক'রে ?'

ঘুমুনোই যখন উদ্দেশ্য, তখন কথা বলার কি দরকার ! চুপ ক'রে রইল পূরবী।

আবার একটা ঢিল ছুঁড়ল সুখেন্দু : 'কিছু হবে না তো ?'

'কি আবার হবে !'

'ফ্যানটা পুরোনো।'

'অনেক দিন অয়েলিং হয় নি বোধ হয়।'

ফুলশয্যা না কণ্টকশয্যা। ঘরের মধ্যে এত ফুলফল থাকলে কি ঘুম আসে, না, কথা আসে। তবু সাহস ক'রে পূরবীর ডান হাতটা

টেনে নিল হাতের মধ্যে। বললে, 'কাল সকালেই তা হ'লে ফিরে যেতে হবে ?'

'আমার বিকেলে গেলেও চলে।' পূরবী যেন খানিকটা স্থতো ছাড়ল : 'আমার সোমবার জয়েনিং ডে, তবে প্রিন্সিপ্যালকে ব'লে ক'য়ে—'

'আমারও তো সোমবার। আমার একেবারে নট নড়ন-চড়ন। তোমাকে পৌছে দিয়ে বিকেল নাগাদ বেরুতে না পারলে আমিও যে জয়েন করতে পারি না—'

এ সবই জানা কথা। আগের থেকেই ছক কাটা। সে সব জানা-শোনা রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করছে। যেন আর কোনো মাঠঘাট নেই নদী-নির্জন নেই।

ভেবেছিল হাতখানি বুঝি সরিয়ে নেবে হাতের থেকে। নেয় নি। বেশ শক্ত হাত, খসখসে। বিজ্ঞানের লেবরেটরিতে কাজ-করা মেয়ে, হাত একটু কর্কশ হওয়াই তো উচিত। দরকার হ'লে সংসারের মাজাঘষাও করেছে হয়তো। তেমনটিই তো চেয়েছিল স্থখেন্দু। কাজ করতে-করতে কঠিন হওয়া হাত। যে হাতে রয়েছে দৃঢ় মুষ্টির ব্যক্তিত্ব। তুকতুকে মুচমুচে হাত দিয়ে সে কি করবে ?

একটিমাত্র রাত। রাতের মতো রাত। তারপর কাল দিনের বেলা একত্র একটু জার্নি করার পর আবার ছাড়াছাড়ি। মাঝপথে পূরবীকে সদরে তার বাপের বাসায় পৌছে দিয়ে স্থখেন্দুকে আবার বেশ খানিকটা যেতে হবে উজিয়ে, ভিন শহরে। দু-জনেরই চাকরির তাগিদে এই নির্মম ব্যবস্থা। নিয়মে একটু নির্মম না হ'লে জীবনে লাবণ্য থাকে না।

স্থতরাং সোমবারই যে যার খুপরিতে গিয়ে ঢুকবে। পূরবী কলেজে, স্থখেন্দু কোর্টে।

তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভেই বিয়ে সারা।

পরীক্ষা পাসের পর থেকেই পাত্রীদের ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, চাকরি পাবার পর তো একেবারে মুষলধারে। তবু ছাতা আড়াল দিয়েছিল এতদিন সুখেন্দু। বলেছিল, শিলাবৃষ্টি চাই।

একবার একথোকে টাকা নয়, মাসে-মাসে টাকা, বছরে-বছরে টাকা। টাকা মানেই আরো টাকা। অর্থাৎ চাকুরে মেয়ে চাই। ও সব টুংটাং কেরানি মেয়ে নয়, বেশ খটখটে রোদালো মেয়ে। বছর পাঁচেক অপেক্ষা করার পর সন্ধান পেয়েছে পূরবীর। মেয়ে-কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর। সে'ও ডগা লতিয়ে-লতিয়ে অনেক দিন আঁকুপাঁকু করেছে। রসিকে রসিক চেনে। আর যায় কোথা!

নমস্কার। কোনো ছলনার ছায়ায় ব'সে দেখা নয়, স্পষ্ট সভা ক'রে মেয়ে দেখা।

বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি ব'লেই পূরবী আপত্তি করে নি। যখন প্রেমে পড়বার সুযোগ নেই, আর যখন বিয়ে করাটাও বিজ্ঞানসম্মত, তা ছাড়া মেঘে-মেঘে বেলাও যখন অনেক হ'য়ে গেছে, তখন গত্যন্তর কি। নমস্কার। নির্ভীক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনি করেছিল পূরবী।

এর আবার দেখবার কি আছে। তবু একবার চোখ বুলাল সুখেন্দু।

শ্যামলা, রোগাটে, রুক্ষ, ঋজু। বেশ একটু গম্ভীর, কঠিন। দাঁড়ানো ও চলায় বেশ একটু স্পর্ধা। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের পায়ে চলা। সে স্পর্ধা যেন ঔদ্ধত্য নয়, দীপ্তি। টানা-টানা চোখ ক্লান্তিতে ভরা। অনেক পড়া ও রাত জাগার ক্লান্তি। অনেক বা অবদমনের। কাঠে ফুল ফোটাতে পারাই তো ইন্দ্রজাল। শুষ্কে ঝরনা নিয়ে আসা। ধূসরে সবুজের সারল্য। একটি স্বাস্থ্যের ঘুমে ক্লান্তির অপসার।

একবাক্যে রাজি হ'য়ে গেল সুখেন্দু। একচক্ষে পূরবী।

'তুই শুধু চাকরি দেখলি। মাইনে কত বউয়ের?'

'মন্দ নয়, আন্দাজ ক'রে নে। কিন্তু চাকরির চেয়ে বেশি কিছু দেখেছি।'

'রূপ?'

'হ্যাঁ, রূপই বলতে পারো। মেধা, বিদ্যা বা প্রতিভা কি রূপ নয়? তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তার কঠোর কর্মশক্তি এ সব কি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে না? এ সব কি নয় আস্বাদের উপযুক্ত?'

'তোর বউ চাকরি করবে এক শহরে, তুই আরেক শহরে, এ-বিয়েতে সুখ কি।'

'সুখকে বেশি কাছে ঘেঁষতে না দেওয়াই সুখ। একটু দূরে-দূরেই তো ভালো, মন জায়গা পাবে ওড়বার।'

'তার চেয়ে বিয়ে না ক'রে চিঠি ছাড়লেই চলে।'

'কেন, কলেজে ছুটিছাটা কম কি। বড়ো ছোটো এটা ওটা তো লেগেই আছে। আমার কাছে আসবে সে সব ছুটিতে। শুধু ভাঁড়ার আর হেঁশেল না ক'রে একটু লেবরেটরি ও স্টাডিসার্কেল করলে মন্দ কি।'

'কিন্তু কত দিন?'

আর কে বুঝত পূরবীর মর্যাদা। মার্কেণ্টাইল ফার্মের ছোকরারা খুব চটকদার বটে, মাইনের দিক থেকে, কিন্তু তারা বউ চায় না তো চায় বইয়ের মলাট। হাতে রাখার দিকে নজর নেই, পাতে দেওয়ার দিকে নজর। আর বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে ভাজে ঝিঙে বলে পটোল। তবু হাকিম মানুষ, যা হোক কিছু লেখাপড়া শিখেছে, লেখাপড়ার মান বুঝবে। রূপের জাদুর চেয়ে বিদ্যার জাদু যে কম নয়, এ যে

মেনে নিল তাকে নাপছন্দ করি কি ক'রে! ঘোড়ায় ওড়া রাজপুত্তুর কোথায় পাব, লোকটি ভালো হ'লেই যথেষ্ট।

'এ তো বিয়ে নয়, চালুনি ক'রে ঘোল বিলোনো।' এদিকে টিপ্পনি ঝাড়তে এল মেয়ে-বন্ধুনীর দল : 'বলি ঘর করবি কোথায়? তুই রইলি বামুনপাড়া আর ও রইল কায়েতটুলি।'

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে ছুটিছাটার চর। তাই ব'লে বল এত কষ্টের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি? নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো জায়গাও তো একটা রাখতে হয় জীবনে।'

'কিন্তু বিয়েটাকেও তো সাকসেসফুল করতে হবে। একসঙ্গেই যদি থাকা না গেল, এ আশার পাশা খেলে লাভ কি।'

'আজকের দিনের বড়ো কথা হচ্ছে ট্যাক্ট, কৌশল। রাধিকা একটা ছেড়ে আরেকটা নিয়েছিল। আমাদের শ্যাম আর কুল দুই-ই রাখতে হবে। স্বামী আর চাকরি।'

'শ্যাম আর কুল সাপ আর নেউল। হয় চাকরি ছাড়ো, নয় স্বামী ছাড়ো।'

যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল সুখেন্দু। আঙুল ক'টিও বিচ্ছিন্ন ক'রে ধরেছিল একটি-একটি ক'রে। এ পর্যন্তই শালীনতা, সুরুচি। এর বাইরেই গোলমাল। আর যাই হই যেন খেলো না হ'য়ে যাই। লঘুতার স্পর্শলেশ না থাকে।

দেয়ালের ঘড়িটাও বেআক্কেল। ওটার আবার কাজ নেই ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাজে। এখন রাত বারোটা, বাজছে ঢং ঢং ক'রে আটটা। যখন শেষ রাতে চারটে হবে তখন বারোটা আওয়াজ হবে।

একজন জেগে-জেগে পাখার স্পার্ক দেখুক, ঘড়ির ঘণ্টা শুনুক আরেকজন।

ঘুম যাক, শালীনতা বজায় থাক। সুখের চেয়ে শান্তি বড়ো। মনের চেয়ে মান। সবার উপরে ডিসিপ্লিন।

টেলিগ্রাম ক'রে আর দরকার নেই, চিঠিই লিখল সুখেন্দু। লিখল, শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছুচ্ছি। নাজিরকে লিখল, যদি পারেন স্টেশনে লোক রাখবেন। আর ডাকবাংলোটাও রাখবেন হাতে।

কী বিপদ! শনিবার আসছে। আর দিন পেল না আসতে? পূরবী চোখে ধুধু দেখল। শনিবার যে আমাদের কলেজের ফাংশান!

এখন এ কথা জানাই কি ক'রে? তার সময় কই? টেলিগ্রাম ক'রে তো জানানো যায় না। প্লিজ কাম অন সানডে—

মেয়ের বিপদ বুঝলেন সুহৃদবাবু। বললেন, 'আমি নিজেই স্টেশনে যাব'খন।'

নতুন মোটা হচ্ছেন তুষারকণা। বললেন, 'আমিও।'

নিশ্চিন্ত হ'ল পূরবী। বাবা মা হাজির থাকলেই নিয়ে আসতে পারবেন। নিজের খুব যেতে ইচ্ছে করছে, কত দিন দেখা নেই। বিয়ের পর প্রায় তিন মাসের ফাঁক। মাঝে দু-দিনের ছুটি গোটা দুই পড়েছিল যাতে পুরো রাত একটার বেশি হয় না। কিন্তু কে কার কাছে যায়? পূরবী যাবে? ছি ছি, লোকে বলবে কি। সুখেন্দু যাবে? সম্ভ্রান্ততার গলায় দড়ি।

লিখেছে সুখেন্দু, সামনেই পূজার ছুটি। তোমারও আমারও। তখন বেরিয়ে পড়ব দু-জনে। তখন ভাব হবে।

মনে-মনে চুল উড়িয়েছে আঁচল ফুলিয়েছে পূরবী। বেরিয়ে পড়ব। পাহাড়ে। সমুদ্রে। দুর্গমে। নির্জনে। শাল শিমুলের বনে। ঝরনার উৎসের কাছটিতে। ইনস্পেকশান বাংলোয়। হোটেলে। লেকের উপর নৌকোয়। ট্রেনের কুপেতে।

কিন্তু তার আগেই এসে পড়েছে লগ্ন। একই মফস্বল শহরে দু-জনের চাকরি। যার-যার আলাদা ক্ষেত্রে কাজ করা, আবার একসঙ্গে থাকা। যেমনটি হবে ব'লে ভাবে নি অথচ হয়েছে। সর্ববিরোধভঞ্জন মীমাংসা।

মায়ের সঙ্গে থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করেছে পূরবী। দোতলার পাশের ঘরটাতেই থাকবে দু-জনে। হল-ঘরটায় আয় না। না না, পাশের ছোটো ঘরটাই ভালো।

মনে-মনে ভাবলে বড়ো ঘরেই বেশি শালীনতা, ছোটো ঘরেই হয়তো বেশি উত্তাপ বেশি নিভৃতি। মন দিয়ে সাজাল ঘর। কোথায় খাট কোথায় ড্রেসিং টেবিল কোথায় লম্বা আয়নাওয়ালা আলমারি কোথায় বা ডিভান। বিয়ের পাওয়া সমস্ত ফার্নিচার এখানে মেয়ের বাড়িতেই র'য়ে গেছে। কোথায় নেবে মফস্বলের মহকুমায় যেখানে দুখানা কাঁঠাল কাঠের চেয়ার টেবিলেই চ'লে যায়। তা ছাড়া জিনিসগুলো তো সুখেন্দুর একার নয়, দু-জনের। অতএব যতক্ষণ দু-জনের সংযুক্ত ঘর না হচ্ছে ততক্ষণ তেমনি থাক যেমনি আছে।

আদর-ভরা হাতে ধুলো ঝেড়েছে পূরবী। আর ক'টা দিন থাক এখানে ঠাসাঠাসি ক'রে, পরে এ শহরেই যখন বাড়ি পাবে— বাড়ি একটা কোন না পাবে— তখন সমস্ত নিয়ে বসবে মেলে-ছড়িয়ে। কি মজা! এমনটি সচরাচর হয় না, প্যাকিংএর হ্যাঙ্গাম নেই, খোঁচাখুঁচির আঁচড় লাগবে না এতটুকু। সব নিটুট থাকবে। সব নিটুট আছে।

কিন্তু শনিবার কেন? পাঁজি দেখে যাত্রা নাকি? রাজকার্যে আবার পাঁজি কি! কবে জয়েন করতে হবে, শনিবারে বিশেষ কি মাহাত্ম্য কিছুই লেখে না! রবিবারটা বিশ্রাম করতে চায় বুঝি। বিশ্রামের ব্যবস্থা তো স্থায়ীই হয়েছে এবার। কি জানি কেমনতর

লোক যেন বাপু। ফুলশয্যার রাতে হাতটা টেনে নিল একটু হাতের মধ্যে— ব্যস— তারপর যত সব আজেবাজে কথা। মেয়ে প্রেমেই পড়ুক বা এম-এই পড়ুক নেমে পড়তে পারে না, যদি কেউ নিজের থেকে তাকে না নামায়। শিষ্টতা ব'লে তো একটা জিনিস আছে।

কি রকম যেন ভারিক্কি ভিতু শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধেয় দেখতে। চিঠি দু-একখানা যা লিখেছে সম্বোধনে শূন্য, ফিল-আপ-দি-গ্যাপ করতে দিলে ছাত্রছাত্রীরা তাতে সবিনয় নিবেদন লিখত। এই দেখ না হালের চিঠিটা। কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই, আগ্রহ আনন্দ নেই। যেন আইনের ভাষায় স্থির ও সংযত একটা বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এখানে বদলি হ'য়ে আসছে এ খবর দিয়ে যে চিঠি লেখে— কত বড়ো সুখের খবর -- তখনো এতটুকু আন্দোলন নেই। যেন একটা নামজারির নোটিশ।

তবু তিন দিনের মুখে জোড়ে ফিরে এসে চ'লে যাবার সময় কি রকম ভাবে যেন চেয়েছিল পূরবীর দিকে। একটু হেসেওছিল বোধ হয়। বোকা-বোকা মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। যেটুকু সমীচীন ঠিক সেইটুকু। মাগো, বুড়ো বয়সে কেউ যেন বিয়ে না করে, এতটুকু রাগ দ্বেষ লোভ মোহ কিছু নেই। পূরবীর নিজেরও আছে নাকি? সেই বা কেমন ক'রে তাকিয়েছিল শুনি? চোখ ছলছল করেছিল নাকি, স্বামীর সঙ্গে যাবে কি যাবে না দ্বিধা করেছিল একবিন্দু? কি ক'রে করবে বলো। রাত ফুরুলেই কাল আবার কলেজ। তেমনি সুখেন্দুরও কাছারি।

যাক, আজ শনিবার, সব আজ চূড়ান্ত হ'য়ে যাবে। উপায় নেই, পূরবীকেই একটু আসতে হবে এগিয়ে। এ তার নিজের ডেরা নিজের গুহা। পারবে সে একটু উপর-চড়া হ'তে। সে শিক্ষয়িত্রী, তাকেই একটু নিতে হবে শিখিয়ে-পড়িয়ে। প্রাবল্যের অভাব মেটাতে হবে ছলনার প্রাখর্যে। ফাংশান ভাঙতে-ভাঙতে প্রায় ন'টা। কলেজেই

তারপর খাওয়াদাওয়া। একেবারে খেয়েদেয়েই বাড়ি ফিরবে। ফাংশান ছেড়ে ফিস্টি ছেড়ে আগে-আগে পালানো দৃষ্টিকটু, অশালীন। কি ভাববে মেয়েরা, প্রফেসররা। স্বামীর সঙ্গে মিলতে চলেছেন উন্মাদিনী। ছি ছি। না, আস্তে সুস্থে সিডিউল ঠিক রেখেই সে ফিরবে। বরং তৈরি হ'য়েই ফিরবে। নাচ ও নাটকের টাটকা হাওয়া গায়ে নিয়ে। যদি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ইতিমধ্যে তবে তো ভালোই। চমকে দেবে ঝলসে দেবে। ঘুমের মধ্যেই তো চমকে দেবার সুখ।

আহা, ঘুমুক একটু আগ-রাতে। গদির উপর খুব নরম আর পুরু ক'রে বিছানা করা। ট্রেনের ধকলের পর নিক একটু বিশ্রাম ক'রে।

বিকেলের দিকে সুহৃদবাবু বললেন গাঢ় মুখে, 'তোর প্রিন্সিপ্যালের এ কি কাণ্ড, মন্ত্রীকে ডেকেছে প্রিসাইড করতে।'

'তিনজনকে ডেকেছেন।'

'তিনজন ?'

'হ্যাঁ, আজকাল তিনজন লাগে। এক সভাপতি, দুই প্রধান অতিথি, তিন উদ্বোধক।'

'বটে ?'

'মন্ত্রী সভাপতি, সম্পাদক প্রধান অতিথি, সাহিত্যিক উদ্বোধক।'

'মন্ত্রী হ'য়েই তো অসুবিধে হ'ল।' চিন্তিত মুখে বললেন সুহৃদবাবু, 'আমার যে যেতে হয় তা হ'লে।'

'বেশ তো যাবে।' পূরবী হাসল।

'আর জানো না বুঝি, কুলু নিজেও একটা পার্ট নিয়েছে।' বললেন তুষারকণা, 'সেটা দেখবে না একটু ?'

'সত্যিই তো, দেখব বৈ কি।' বললেন সুহৃদবাবু, 'তুমিও তা হ'লে চলো।'

ভদ্রলোকের তা হ'লে গতি কি হবে? যিনি আজ আসছেন সন্ধ্যার ট্রেনে?

সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে। তরুণ যাবে স্টেশনে। কি রে, পারবি নে?

'খুব পারব।' ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, শার্টের কলার ফুলিয়ে অপার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে।

'চিনতে পারবি তো? মনে আছে চেহারা?'

'মনে না থাকলেও ধরন-ধারণ দেখে ঠিক বার করতে পারব।' খুব চালের মাথায় তরুণ বললে।

'তবে আর ভাবনা কি, বলবি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ন'টার মধ্যেই আমরা ফিরব।' বললেন সুহৃদবাবু।

'ঘর-দোর বিছানা বাথরুম সব তৈরি।' তুষারকণা লেজুড় জুড়লেন: 'খেতে চাইলে বলা আছে ঠাকুরকে। বুঝলি? আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় না যেন দেখিস।'

সমস্তটা পথ ভাবতে-ভাবতে আসছে সুখেন্দু। চারদিককার মাঠ-ঘাটও ভালো লাগছে দেখতে। ধানখেত মেঠো পথ গরু বাছুর লোক-জন। কোনো দিন খায় না, আজ ভালো লাগছে খুরিতে ক'রে চা খেতে। কপট পোশাকে নয়, ঘরোয়া সরল পোশাকে দেখবে আজ পূরবীকে। মন্দ লাগবে না। গম্ভীরকে বিগলিত করবে, আড়ষ্টকে পরিমুক্ত। বেশ দেখতে লাগবে সেই অবতরণ। বিদুষী বিনতা হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধা। প্রতীক্ষা থেকেই সব হবে।

সন্ধের শেষে ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছুল স্টেশনে।

ছুটো পিওন এসেছে দেখছি।

'আমিও এসেছি।' ফুটফুটে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে।

'কে তুমি?'

খুব স্মার্ট শোনাবে মনে ক'রে ছেলেটি বললে, 'আমি আপনার শালা, তরুণ।'

দু-একটা শাড়ির স্তূপ বা শিখা বা ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো সুখেন্দু বললে, 'আর কেউ আসে নি ?'

'কি ক'রে আসবে ! দিদিদের কলেজে যে ফাংশান। অনেক সব হোমরাচোমরা এসেছে—' লিস্টি দিলে তরুণ : 'বাবা-মাকেও তাই যেতে হ'ল।'

'তুমি গেলে না ?'

'না, ওটা মেয়েদের কলেজ যে। বাবা-মা গেছে স্পেশাল ইনভিটেশনে। চলুন, গাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি। এই তো মাল। দুটো সুটকেস আর এই হোল্ড-অল ?'

পিওনরা হাত লাগাতে এল।

'ডাকবাংলো ঠিক আছে ?' সুখেন্দু জিগ্‌গেস করলে।

'না, হুজুর।'

'না ?' ব'সে পড়ল সুখেন্দু : 'তবে গাছতলা ?'

'না ! বাড়িই পাওয়া গেছে।' পিওনদের একজন বললে।

এর মতো পাওয়া আর কিছু হ'তে পারে না দুনিয়ায়, এমনি আনন্দে সুখেন্দু বললে, 'বাড়ি পাওয়া গেছে ? কোন বাড়ি ?'

'যাঁর জায়গায় আসছেন তিনি ফ্যামিলি নিয়েই দুপুরের ট্রেনে চ'লে গিয়েছেন। সেই বাড়িটাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢুকতে হবে। নইলে প্রাইভেট বাড়ি, কে কখন গাজুরি ঢুকে পড়ে ঠিক নেই। অবিশ্যি আজ রাত্তিরটা—'

'চলো চলো ঝটপট—'

'মালপত্র ফার্নিচার কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে দখল নিলেই তো চলবে।'

তরুণ এগিয়ে এল: 'লোকজন লাগে পিওন দু-একজনও থাকতে পারে, আমরাও না হয় পাঠিয়ে দেব দরকার হ'লে। কিন্তু আপনার যাবার কি দরকার! আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন, সবাই ব'লে দিয়েছেন,— কষ্ট হয়েছে কত ট্রেনে—'

ও সব কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনল না। মালপত্র চাপিয়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ির উপর চ'ড়ে বসল সুখেন্দু।

সঙ্গে-সঙ্গে তরুণ সারা পথ এল সাইকেল ক'রে। অনেক বোঝাল। এক রাত্রি কি খালি বাড়িটা রাখা যায় না কবজার মধ্যে? নিশ্চয়ই যায়। এত তাড়াহুড়ো ক'রে রাতারাতি দখল নেওয়ার মাথাব্যথা কি।

কত কাকুতি মিনতি করছে ছেলেটা, হেরে যাচ্ছে বাবা-মার কাছে দিদির কাছে, ন্যস্ত কার্য উদ্ধার করতে পারছে না, একটু বোধ হয় মায়া হ'ল সুখেন্দুর। বললে, 'বাড়িটা কেমন দেখে আসতে ক্ষতি কি।'

'তা না হয় দেখুন। কিন্তু থাকা চলবে না। আমাদের ওখানে সব তৈরি হ'য়ে আছে। ঘর-দোর বিছানা বাথরুম চা-খাবার—'

বাড়ি দেখে সুখেন্দু একেবারে পুলকিত। বা, চমৎকার।

কানা গলির মধ্যে একটা বধির ইষ্টকপুঞ্জ। তার উপর এখন তো ছাড়াবাড়ি, ভূতের আস্তানা। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আবর্জনায় চারদিক ভরা। উনুন ভেঙে দিয়ে গেছে, গাছপালা একটাও আস্ত রাখে নি, ইলেকট্রিক বালবগুলো তো নেবেই, একটা পেরেকও গাঁথা নেই দেয়ালে। আদালত থেকে পাওয়া নড়বড়ে ক'টা টেবিল চেয়ার শুধু প'ড়ে আছে।

'ঘর-দোর একটু পরিষ্কার ক'রে রাখা যেত না?'

'উনি এই তো গেলেন। তা ছাড়া শুনেছিলাম আজ রাতটা—'

'একটা সুইপার ধ'রে নিয়ে এস।' প্রায় ধমকের সুরে সুখেন্দু বললে, 'আর ক'টা বালব। জলটল আছে তো ? বালতি ? মগ ?'

'সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।' আর্দালি কখন শামিল হয়েছিল, উল্কা-বেগে বেরিয়ে পড়ল।

'এইখানে থাকবেন নাকি ?' তরুণ আবার এগিয়ে এল : 'পাগল না মাথা খারাপ !'

'নিজের বাড়ি পেলে আর কি চাই ? স্বর্গের চেয়েও বড়ো পাওয়া এই বাড়ি পাওয়া।'

কিছুতেই ঘাড় সিধে করল না সুখেন্দু। ফিরিয়ে দিল তরুণকে। টেবিলের উপর জ্বলন্ত টর্চের মুখটা দরজার দিকে রেখে পিছনে অন্ধকারে চেয়ারে ব'সে সিগারেট টানতে লাগল।

সাঁই-সাঁই ক'রে সাইকেল চালিয়ে তরুণ এক দৌড়ে পৌঁছুল এসে কলেজে। কী লজ্জা, ন্যস্ত কাজ উদ্ধার করতে পারল না !

একটা ভরা পিনকুশনের মতো ভিড়। বাড়িতে বিশেষ অসুখ, অ্যাকসিডেণ্ট, এখুনি খবর দিতে হবে, এমনি অনেক বায়নাক্কার পর তরুণ ঢুকল হলের মধ্যে। সুহৃদবাবুর কানের কাছে মুখ রেখে বললে ফিসফিস ক'রে, 'জামাইবাবু আমাদের বাড়িতে উঠল না।'

'সে কি ? কোথায় উঠল ?'

'বলছি, বাইরে এস।' কে কখন শুনে ফেলবে তরুণের তখন আরেক লজ্জা।

'এখুনি উঠব কি ক'রে !' পাশের থেকে বললেন তুষারকণা : 'এই সিনেই তো কুলুর অ্যাপিয়ারেন্স। তুমি যাও, সব ব্যবস্থা করো গে।'

সুহৃদবাবু বাইরে এসে শুনলেন সব ব্যাপার। একটা সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ইলেকট্রিক বালব এসে গেছে। উপরের একটা ঘর হাত লাগিয়ে দুরস্ত করেছে সবাই। হোল্ড-অল খুলে মেঝেয় বিশীর্ণ একটা বিছানা পর্যন্ত করা হয়েছে। সামনের টেবিলে চায়ের পট-কাপও এসে গেছে সামনের দোকান থেকে।

'এ কি, তুমি এখানে উঠেছ কেন? চলো চলো,' সুহৃদবাবু একেবারে হাঁ-হাঁ ক'রে পড়লেন: 'কই রে, গাড়ি ডাক।'

সমীচীন ভঙ্গিতে প্রণাম করল সুখেন্দু। বললে, 'বাড়িটা যখন পেয়ে গেছি ঢুকে পড়াই ঠিক মনে করলাম। স্বত্বের দশভাগের নয় ভাগই দখল।'

'বাড়ি কে নেয়? প্রিডিসেসরের বাড়ি সাকসেসরের হয়। নাজির কি করতে আছে? বাড়িওলা কে? কিচ্ছু ভয় নেই। এর চেয়েও ভালো বাড়ি ঢের যোগাড় হবে। তুমি চলো আমার ওখানে—' কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

সুখেন্দু হাত কচলাল। বললে, 'নিজের বাড়ি পেয়ে কায়েম হ'য়ে বসাই ভালো। পরে যাব'খন এক সময়। এখানেই তো পোস্টিং।'

অনেক অনুনয় করলেন সুহৃদবাবু। সুখেন্দু বিনয়ে পাথর হ'য়ে রইল।

সুহৃদবাবু ছুটলেন মেয়ে-কলেজে।

আলাদা রিক্শায় এবার স্ত্রীকে নিয়ে চললেন। তোমার কথায় যদি কিছু হয়।

কিছুই হ'ল না। যত সাধ্যসাধনা আদর-সোহাগ সব ব্যর্থ হ'ল। অশালীন অসংগত কিছুই করছে বলছে না সুখেন্দু। প্রণামান্তর বললে, 'যখন একদা বাসা একটা করতেই হবে আর যখন ভাগ্যক্রমে আসতে-আসতেই পেয়ে গেছি, তখন আর সেটা ছাড়ি কেন?'

বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো বৃথা, রাগে গরগর করতে-করতে বাড়ি ফিরলেন তুষারকণা। আলাদা রিক্‌শায় সুহৃদবাবু।

পূরবীর কাছে খবর গিয়েছে কলেজে। সে শুনে তো টং। মা-বাবার পর্যন্ত অনুরোধ রাখল না!

লেডি প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তুমি এবার চ'লে যাও।'

ঝলসে উঠল পূরবী : 'কোথায়?'

প্রিন্সিপ্যাল হাসলেন : 'তোমার নিজের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, আমার এতদিনকার নিজের বাড়ি। সে তো যাবই। তাড়াতাড়ি কি। খেয়েদেয়ে যাব।'

'না, আগেই যাও। এই ফিস্টটা কোনো কাজের ফিস্ট নয়। শোনো, তুচ্ছ কারণে জীবনভোজ নষ্ট কোরো না। বিয়েটা সব ফাংশানের চেয়ে বড়ো ফাংশান। সেটাকে সাকসেসফুল করো—'

আত্মসম্মান খুইয়ে? ককখনো না। একটা খাস্তা লুচি ও আলুর দমের আস্ত একটা আলু মুখে পুরল পূরবী। পুরুষের খেলনা হ'তে আসি নি। দড়িধরা খেলনা হ'তে আসি নি। আসি নি ব'য়ে যেতে। এবার পুরল একটা রসগোল্লা। গালগলা ফুলিয়ে খেতে লাগল। কিসের দৈন্য কিসের ক্লেশ! সব শেষ হ'য়ে যাক। চাকরি আছে।

খেয়েদেয়ে যেমন ফেরবার তেমনিই ফিরল পূরবী। তার নিজের বাড়ি, তার এতদিনকার নিজের বাড়ি। বাবা-মা কিচ্ছু বললেন না, বলবার কি বা আছে, কিন্তু তাঁরা যে অপমানিত হয়েছেন, অন্তত প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এ জ্বালায় জ্বলতে লাগল। যদি এখন একবার আসত চোখের সামনে, বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে বলত। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। ছি ছি, বিকেলে কতগুলি ফুল আনিয়ে রেখেছিল, সেগুলি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। ডবল

বিছানার বাড়তি বালিশ দুটো ছুঁড়ে ফেলল খাটের এক পাশে। শুয়ে পড়ল। আলো নেবাল না। ছি ছি, আলমারির আয়নায় শুয়ে-শুয়ে দেখা যাচ্ছে নিজেকে। উঠে পড়ল এক ঝটকায়। একটা মোটা চাদর ঝুলিয়ে দিল আলমারির গায়ে, একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন বই হাতে নিয়ে শুলেই ঘুম আসে। ছি ছি, আজ ঘুমের ওষুধ খেলেও আসবে না। না আসুক, পরীক্ষার খাতা দেখব। ভাগ্যিস চাকরিটা ছিল, নইলে মা-বাবা হয়তো ব'লে-ক'য়ে গাড়িতে চড়িয়ে পাঠিয়ে দিত। স্বাধীন সমর্থ মেয়ের কাছে তাঁরা প্রতিকার চান। ছোটো ভাইটা পর্যন্ত এর সমুচিত উত্তরের প্রতীক্ষা করছে।

যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। যেন সাধন ক'রে পাবার মতন কিছু নেই আমার মধ্যে। লেখাপড়া শিখি নি। দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি না। জীবিকার্জনের ক্ষমতা নেই।

তুষারকণা বলছেন, শুনতে পেল, 'টিফিনকেরিয়ার ক'রে খাবার পাঠিয়ে দিই।'

সুহৃদবাবু বললেন, 'দাও। আমাদের কর্তব্য আমরা ক'রে যাই। ওদের কর্তব্য ওরা বুঝবে।'

কর্তব্য! আইনটা এখনো পাস হয় নি, কর্তব্য হচ্ছে আদালতে গিয়ে নালিশ ঠোকা। আমি পারব না নিয়ে যেতে। তরুণকে বলেছিল, বোধ হয় সে খেঁকিয়ে উঠেছে। হাকিম তো নয় হিটলার। ঘাড় একবার ত্যাড়া করেছে তো সিধে করে কার সাধ্যি।

'না, ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি।'

'চা খাইয়েছ, এবার ভাত খাওয়াতে পারবে?' আর্দালিকে জিগ্গেস করল সুখেন্দু।

'সব খাওয়াতে পারব।' খুব ডাঁটের উপর বললে আর্দালি। 'মানে কাছেই ভালো হোটেল আছে।'

'এক প্লেট রাইসকারি নিয়ে এস। আর সিগারেট আনতে পারবে?'

'যা বলবেন তাই আনতে পারব।'

খাচ্ছে সুখেন্দু, শ্বশুরবাড়ির ঠাকুর টিফিনকেরিয়ার নিয়ে হাজির।

'এ নিয়ে আর এখন কি হবে? দেখছ না খাওয়া প্রায় শেষ। এখানে বাড়তি লোক নেই যে সদ্ব্যবহার করবে। সুতরাং ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

খাবারটা অন্তত গেল কিনা তাই শোনবার জন্যে কান পেতে ছিল বুঝি পূরবী। শুনল খাবারও ফিরিয়ে দিয়েছে। যাক, সমস্ত সম্পর্ক—আহা, কী বা একটু হাতছোঁয়া সম্পর্ক—এইখানেই মুছে গেল। আলোটা নিবিয়ে দিল এতক্ষণে। এইবার শান্তিতে ঘুম আসবে নিশ্চয়ই, ছেলেবেলার স্কুলের ছবি প্রথম বয়সের কলেজের ছবি ভাবতে লাগল। কত বড় বিছানা! ছোটো বোন ভূপালি পর্যন্ত আজ পাশে নেই। একা ঘরে ঘুমুনোর শান্তি কত দিন আসে নি জীবনে!

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরিয়ে মেঝের উপর পাতা হতভাগা বিছানাটার দিকে তাকাল সুখেন্দু। একেই বলে নিয়তি। প্ল্যাটফর্মে যে যাত্রী শোয় তার একটা আশা থাকে এক সময় না এক সময় ট্রেন আসবে। এ কি আশাহীন বিছানা! এখানে কি ক'রে ঘুমুবে, কোন দুঃখে, কার উপর রাগ ক'রে! কত শৌখিন ঘরে পরিপাটি ক'রে না জানি বিছানা হয়েছিল আজ! শুধু বিছানা! কত ফুল না জানি! শুধু ফুল! কত নম্রতা কোমলতা না জানি! শুধু নম্রতা কোমলতা!

কোনো মানে হয় আর্দালিকে পাশের ঘরে নিয়ে শুয়ে! মেঝের

উপর ইঁদুর-আরশুলার সহবাসী হ'য়ে ? এখানে কি ঘুম আসবে, না ঘুমে সুখ আসবে ? তার চেয়ে সোজা চ'লে যাই গোকুলে। পৌরুষে আঘাত লাগবে। তার চেয়ে মেঝেয় শুয়ে পিঠে আঘাত লাগারই বেশি সম্ভাবনা। বরং এই অবস্থায় এই ভূমিকায় গেলেই কিছুটা কথা বলার বিষয় পাওয়া যাবে। কিছু বা ব্যাখ্যা বক্তৃতার। আর বাদানুবাদের পরই তো রাগানুরাগ। খেলো দেখাবে, হালকা দেখাবে ? দেখাক না, কে দেখছে ! তার জন্যে হীরের আংটির মতো এমন একটা রাত জলে ফেলে দেবে ?

দরজা যদি বন্ধ হ'য়ে যায় এর মধ্যে ? দরজা খুলে দেবে তো ? ধাক্কা দেব। হল্লা করব। পৌরুষ প্রমাণ করব। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাব হরণ ক'রে।

আর্দালিকে বললে, 'একটু হাওয়া খেয়ে আসি। যদি দেখ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরি নি ভাববে কোথাও গিয়েছি।'

কি রকম চোখে তাকাল আর্দালি। তার জন্যে বাইরে যাওয়া কেন ? তাকে বললে নিজেই সে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে।

একটা সাইকেল রিক্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুখেন্দু। লাস্ট ট্রেন এই এল কলকাতা থেকে। এটাই আবার ছেড়ে যাবে এক্ষুনি।

'এসেছে, এসেছে।' বাড়ির ছেলেমেয়েরা, যারা তখনো ঘুমোয় নি, কোলাহল ক'রে উঠল।

ওরে, পূরবীকে খবর দে। দরজায় ধাক্কা মেরে জাগা। ঘর খুলে দিতে বল। শুধু আসে নি, এখানে থেকে যাবার জন্যে এসেছে।

কোথায় পূরবী ? তার ঘর খোলা। অন্ধকার।

খোঁজ, খোঁজ, কোথাও চিহ্ন নেই। হাঁকডাক কর, কোথাও সাড়া নেই। ছাদ বাথরুম খাটের তলা আলমারির আড়াল, সব

ফক্কা। কেউ বললে, হস্টেলে ফিরে গিয়েছে বুঝি, কেউ বললে লাস্ট ট্রেনে কলকাতা গেল বোধ হয়।

এ যে পুলিশ কেস ক'রে বসল। এ ঝক্কি কে নেয়! হাকিমের স্ত্রী ফেরার এ কি কেলেঙ্কারি! কেলেঙ্কারির চেয়েও ঝকমারি বেশি। চুপ ক'রে থাকলেও তো চলবে না, কিছু একটা তদবির-তালাশ করতে হবে। আর থানা পুলিশ করতে গেলেই তো ছোটো কথা এসে পড়বে, স্বামী পছন্দ হয় নি, ছোকরা কারু সঙ্গে চম্পট দিয়েছে।

এ যে তর্পণেই গঙ্গা শুকোল। খোঁজবার ওজুহাত ক'রে কেটে পড়ল সুখেন্দু।

আর্দালিটা ভালো। আলো জ্বালিয়ে রয়েছে তার প্রতীক্ষায়।

উপরে উঠেই সুখেন্দু নেমে এল তরতর ক'রে : 'এ সব কি! এ সব এনেছ কেন? এ সব তোমাকে কে আনতে বলেছে?'

'আমি কি জানি! নিজের থেকে এসেছেন।'

'নিজের থেকে এসেছেন?' সুখেন্দু হু-হু ক'রে উঠে গেল উপরে।

এসে দেখল, মেঝের উপর পাতা প্ল্যাটফর্মের বিছানায় কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে পূরবী।

সিঁড়ি

সিঁড়িটা অন্ধকার।

একবার একটা সাপ দেখেছিল সিঁড়িতে। যদি সেটা আবার বেরিয়ে আসে কোনো গর্ত থেকে। যদি গা বেয়ে ওঠে কিলবিলিয়ে।

উঠুক। তবু এতটুকু ভয় পাবে না কেতকী।

রেলিং ঘেঁষে সিঁড়ির ধাপের উপর জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে থাকে। আঁচলটাকে বড়ো ক'রে খুলে আগাপাশতলা জড়িয়ে নেয়। মাথা কাত ক'রে রেলিঙে রেখে একটু চোখ বোজবার চেষ্টা করে। সাধ্যি কি একটু তন্দ্রা আসে। পাশের ঘরে হৈ-হল্লার ঢেউ থেকে-থেকে এসে ধাক্কা মারে।

যদিও সর্বত্র চুপ-চুপ, তবু উত্তেজনা মাঝে-মাঝে সীমা ছাড়ায়। খিল-চাপানো বন্ধ দরজাও তাকে ঠেকাতে পারে না।

একটু পরেই আবার সামলে নেয়। ফিসফিসানির শালীন স্বরে গলার স্বর নামিয়ে আনে।

ক'টা বেজেছে না জানি!

নিচে ভাড়াটেদের ঘড়িতে দুটো বাজল বুঝি। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল কেতকী।

টুক ক'রে পাশের ঘরের দরজার খিলটা খুলে গেল।

ঘড়ির শব্দের চেয়েও এ শব্দটা যেন বেশি মারাত্মক। ঘড়ির শব্দে তবু আশা, আর এই শব্দে আতঙ্ক।

এবার কেউ একজন নামবে। বাইরে যাবে। বাইরে মানে বাড়ির

পিছনের মাঠটুকুতে, ও-পাশে দেয়ালের ধারে। আবার কতক্ষণ পরে উঠে আসবে গুটিগুটি। যতক্ষণ না ফিরে আসে, যতক্ষণ না ফের ঘরে গিয়ে ঢোকে ততক্ষণ অনড় অশান্তি।

খেলা ভেঙে গেলে একসঙ্গে অনেকগুলি পায়ের শব্দ হ'ত। খেলা এখনো ভাঙে নি।

একজন শুধু নামছে।

টর্চ না ফেললে নামবে কি ক'রে! কেউ-কেউ টর্চটা একবার টিপে ধ'রেই সিঁড়িটাকে আন্দাজ ক'রে নেয়, বড়োজোর শেষ বরাবর গিয়ে আরেকবার টেপে। দেয়ালে গা লাগিয়ে বেশ চওড়া ব্যবধান রেখেই নামে-ওঠে। যেন কত অপরাধী। যার ঘর তাকেই বাইরে বসিয়ে রেখে নিজেরা ভিতরে ব'সে গুলতানি করছে, যেন গরুচোর হ'য়ে আছে।

কিন্তু একজন কিছুতেই তার টর্চের বোতামে ঢিল দেয় না। সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রেখেই আসে-যায়। ভাবখানা এই, সব দিকই ভালো ক'রে দেখে-শুনে নামব। কোথায় নাকি কবে সাপ বেরিয়েছিল তাই একটু সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নামে প্রায় চোরধরা পাহারা-ওয়ালার মতো। তা ছাড়া আবার কি। ঘরের জন্যে রীতিমতো ভাড়া দেয় ক্লাব।

তাই টর্চটা মাঝে-মাঝে গায়ে এসে পড়ে। যখন নিচে থেকে ওঠে, অসাবধানে মুখ যদি খোলা থাকে, প্রায় মুখের উপর। দুই চোখে সঘৃণ বিরক্তির ঝলক দিয়ে টর্চের আলোর প্রত্যুত্তর দেয় কেতকী।

আজকের খেলা কি তিনটেতেও ভাঙবে না?

প্রায় শেষরাতের দিকে ভাঙল। লোকগুলো চ'লে গেলে কেতকী ঢুকল পাশের ঘরে। বিছানা করতে বসল।

নিজের থেকে কিছু জিগ্‌গেস করতে সাহস হয় না। স্বামীই কখন বলবে তার জন্যে কান পেতে থাকে।

'আজও কিছু পারলাম না জিততে।' যেন কোন অতল গহ্বর থেকে বলল সুধাময়।

বুকটা ভেঙে গেল কেতকীর।

কিন্তু কি সে সাহায্য করতে পারে? এই একমাত্র বিছানা করা ছাড়া?

ও-পাশের ঘর থেকে কোলের শিশু দুটো কেঁদে উঠল তারস্বরে। ওরা কি ক'রে যেন বুঝতে পারে খেলা এতক্ষণে শেষ হয়েছে, বিদায় নিয়েছে লোকগুলো, ফাঁকা হয়েছে মা'র ঘর। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় কেতকী। শ্বশুর দরজা খুলে শিশু দুটোকে ঠেলে বার ক'রে দেয়। কান্না যে শুধু মায়ের জন্যে নয়, মারের জন্যেও, এটা কান্নার স্বরগ্রাম শুনেই বোঝা যায়। মাকে পেয়ে শিশু দুটো ফোঁপাতে থাকে। একটাকে কোলে নিয়ে ও আরেকটার হাত ধ'রে চ'লে আসে কেতকী। নতুন ক'রে আবার ওদের ঘুম পাড়ায়।

দুটি মাত্র ঘর। তার ওদিকে রান্নার এক ফোঁটা জায়গা আর এক চিলতে কলতলা। মাঝখানে একফালি বারান্দা। আর দোতলা থেকে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির ক'টা ধাপ।

শাশুড়ি নেই, শ্বশুর হরিসাধন থাকে সিঁড়ির দূরের ঘরটাতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যেটা ঘর সেটা সুধাময়ের। সুধাময়ের একার নয়, সুধাময় আর কেতকীর। শুধু সুধাময় আর কেতকীরই বলা যায় কি ক'রে? সুধাময়, কেতকী আর তাদের পাঁচ-পাঁচটি শিশুর। বড়োটি নয়, ছোটোটি দুই।

এককালে খুব বোলবোলাও ছিল হরিসাধনের। আদালতের

মুহুরি ছিল। কোন অন্ধিসন্ধি তাক ক'রে হাতিয়ে-তাতিয়ে নিলেমে এই একটা বাড়ি কিনে ফেলেছিল। মেদমাংস নেই, হাড়ের উপর যেমন ঢ্যাঙা দেহ তেমনি একটা খাড়া বাড়ি। আগে শুধু একতলা ভাড়া ছিল, বেশ গা হাত পা ছড়িয়ে ছিল তখন সংসার। কি দুগ্র'হ হ'ল, হরিসাধন গেল ব্যবসা করতে। কেতকীর যখন বিয়ে হয় তখন এই-ই রব ছিল, কলকাতায় বাড়ি, বাপের ব্যবসা, বাপের একমাত্র ছেলে, লেখাপড়া বেশি না করলেই বা কি। যুদ্ধের বাজারের ফাঁপা ব্যবসা, ফেঁসে গেল। দোতলায় ভাড়াটে বসল। বাড়িতে দু-কিস্তিতে বন্ধক পড়ল। তবু ইনকামট্যাক্স ছাড়ল না। ভাড়াটেদের উপর হুকুম-জারি হয়েছে, বাড়িভাড়া হরিসাধনকে না দিয়ে আমাদের দেবে। ঘোর দারিদ্র্যে ডুবল। এমন হ'ল ইলেকট্রিকের বিল শোধ করতে পারল না। কোম্পানি এসে লাইন কেটে দিল। ভাড়াটেদের ইলেকট্রিসিটি চুরি করতে গেল তার লাগিয়ে, ফৌজদারিতে ফাইন হ'য়ে গেল।

ঘরে হয়তো বা লণ্ঠন বা ক্যাণ্ডেল জ্বলে, সিঁড়িটা অন্ধকার।

এককালে মকদ্দমার দালাল ছিল হরিসাধন, এখন আরো নিচু-স্তরের দালালি করে। আর সুধাময় জুয়া খেলে।

কোথায় খেলবে? নিজের থাকবার ঘরটাকেই জুয়াড়িদের কাছে ভাড়া দিয়েছে। এখন এই প্রত্যক্ষ রোজগার।

শ্বশুরের কাছে হাত পাতলে বলে, বাজার বড়ো মন্দ।

তারপর কেতকী যাতে শুনতে না পায় তেমনি ক'রে বলে আপন-মনে, কে আর আসবে বলো এ দিকে? অঢেল দুধ যেখানে ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে ঘোলের কে খবর করে?

যদি কখনো কিছু কামায় নেশা-ভাঙ ক'রে উড়িয়ে দেয়।

কোথাও ড্যালা কোথাও খোদল ছেঁড়া তোশকে শিশু দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে কেতকী জিগগেস করে, 'কে সবচেয়ে বেশি জেতে ?'

'ঐ মন্মথ।'

'কোন লোকটা ?'

'ঐ যে লোকটা সবচেয়ে বেশি ঢ্যাঙা, গোঁফ আছে, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়— তারই পকেট ভর্তি।' মেরুদণ্ড নেই এমনি ভাবে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে সুধাময় : 'তা অন্ধকারে তুমি চিনবেই বা কি ক'রে ? আর চিনেই বা লাভ কি ?'

কি রকম যেন একটা বিশ্রী সুর বাজল সুধাময়ের গলায়।

কেতকী ফোঁস ক'রে উঠল : 'তার মানে ?'

'মানে আবার কি।' পিঠ যেন আরো ছেড়ে দিল সুধাময় : 'চিনলেই বা তুমি কি করতে পারো ? কি তোমার ক্ষমতা আছে ?'

তার যে হাড় ক'খানা জিরজির করছে, ধুলো উড়ছে তার পরনের শাড়িটা এ বুঝি তারই কটাক্ষ। গর্জে উঠল কেতকী : 'সিঁড়ি দিয়ে যখন নামবে একা-একা তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি।'

'সে কি ? সে কি অপরাধ করেছে ?' খাড়া হ'য়ে বসতে চেষ্টা করল সুধাময়।

'রোজ রোজ জিতে যাবে, আমাদের সর্বস্বান্ত ক'রে যাবে, সেই অপরাধ।'

'তাতে তার কি হাত আছে ! ভাগ্য তার পক্ষে। আমিই হেরে যাই। আমিই হেরে গেছি।'

দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢাকল কেতকী। বললে, 'তোমার হাতেই আমার হার।'

'কিন্তু তুমি জিততে পারো?' গলার আওয়াজটা কুটিল হ'তে-হ'তে আর্দ্র হ'য়ে উঠল : 'তোমার জিতে আমাদের সকলের জিত।'

'তার মানে?'

'তার মানে বেঁচে থাকাটাই একটা জুয়ো খেলা। কেউ খেলে আলো জ্বেলে, কেউ খেলে অন্ধকারে।'

'তুমি আমার স্বামী না?'

'কে জানে! আমার তো মনে হয়, কারুরই কোনো সম্পর্ক নেই, পরিচয় নেই। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়ো খেলতে বসেছি সবাই। যার-যার তাস আলাদা। তুরুপ নেই ফেরাই নেই— তুমিও হারছ, আমিও হারছি।'

'লজ্জা করে না বলতে?' বালিশে মাথা রাখতে যাচ্ছিল কেতকী, আবার উঠে বসল।

'আর করে না।'

'পরনে একটা আস্ত শাড়ি নেই, হাতে-গলার সমস্ত গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছ, হাতে শুধু এই দুটো সোনার রুলি—'

'তারপর যমের অরুচি রোগের ডিপো ঐ দেহ— যাও, ব'লে যাও,' বহু কষ্টে একটা বিড়ি ধরাল সুধাময় : 'সব রং-রাংতা উঠে যাওয়া মাটির ঢেলা। কিন্তু যে খেলে সে কানাকড়িতেও খেলে।'

'আমার একটা কানাকড়িও নেই। তোমাদের সংসারের সওদায় তা খরচ হ'য়ে গিয়েছে।' বিছানা ছেড়ে স'রে বসল কেতকী।

'সব খরচ হ'য়েও তবু কিছু থেকে যায়।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সুধাময় : 'তাই তুমিও একেবারে শেষ হ'য়ে যাও নি। তোমার আবরণ আছে, অন্ধকার আছে। ভদ্রতার আবরণ, নিষেধের অন্ধকার।'

উঠে দাঁড়াল কেতকী। ঘুরে দাঁড়াল। বললে, 'আমি তোমাকে

ব'লে দিচ্ছি, কাল থেকে খেলা বন্ধ ক'রে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে এই আড্ডা।'

'এর বেশি আর পারবে না?' যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল সুধাময়। তারপর সুর বাঁকা ক'রে বললে, 'কিন্তু তুমি বললেই কি সব হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। একশ' বার হবে। আমি পুলিশে খবর দেব।'

'তা হ'লে এখন তবুও বাড়ির মধ্যে সিঁড়ির উপর বসছ, তখন বাড়ির বাইরে সিঁড়ির উপর গিয়ে বসতে হবে।'

'নির্লজ্জ অসভ্য কোথাকার!' খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কেতকী।

কান খাড়া করল সুধাময়। কি, এখুনি পুলিশে খবর দিতে ছুটল নাকি? না কি গেল ভাড়াটেদের কাছে নালিশ করতে? না কি বেরুল নিরুদ্দেশে?

না, কিছুই করে নি। অন্ধকারে তার সুপরিচিত সিঁড়ির ধাপটিতে গিয়ে বসেছে। বাকি রাতটুকু অমনি ভাবেই কাটিয়ে দেবে নাকি?

তা ছাড়া আবার কি। যার ভিতরে এত পাপ তার সংস্পর্শে সে আসবে না।

একে হারের মার তায় অনিদ্রার বোঝা। সুধাময়ের ইচ্ছা হ'ল না যে ওঠে, সাধে, টেনে নিয়ে আসে কেতকীকে। মনে-মনে বললে, ব'সে থাকো। জুয়ো যে খেলে, যতই সে মাঝপথে জিতুক, শেষ পর্যন্ত সে হারে, ঘাল হয়। সেই শেষদিনটির জন্যে অপেক্ষা করো। জিতব আমরা।

সেই থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে ভেদ। কথা বন্ধ।

কিন্তু কি কেতকীর সাধ্য এর বেশি কিছু করতে পারে?

রাত দশটার মধ্যে সংসারের সমস্ত পাট তুলে দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বশুরের জিম্মায় রেখে আবার তার পরিচিত সিঁড়ির ধাপটিতে এসে বসে। সাড়ে দশটা থেকেই টর্চ টিপে-টিপে আসতে থাকে জুয়াড়িরা। তার শোবার ঘরের ভাড়াটেরা। সিঁড়ির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে জড়পুত্তলীর মতো ব'সে থাকে কেতকী।

এমনি রোজ। রাতের পর রাত।

কোন লোকটা ঢ্যাঙা, গোঁফওয়ালা, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়, যেন চিনতে পেরেছে কেতকী।

জানোয়ার যদি শিকারী হয় সে বুঝি ঘ্রাণেও টের পায়।

খেলার থেকে উঠে-উঠে নেমে যায় একেক ক'রে! আবার উঠে আসে। যার যেমন সুবিধে। যার যখন দরকার।

এই বুঝি নামছে মন্মথ!

কেমন ধীর নিঃশব্দ পা। কেমন ভারি-ভারি। থামা-থামা।

কোন শব্দের ভাষা নেই? পায়ের শব্দেরও ভাষা আছে।

আর-সকলের টর্চ দেয়ালের দিকে ঝাপটা মারে, মন্মথর টর্চ এদিকে-সেদিকে! আর-সকলে পথ দেখে, মন্মথ দেখে পথে কি প'ড়ে আছে।

নিচে থেকে ওঠবার সময় যখন টর্চ ফেলে তখনই অসহায় লাগে। না, অসহায় কেন? এক ঝলক হাসি ফিরিয়ে দেবে কেতকী। শোধ দেবে।

'আহা, কি কষ্ট আপনার!' উঠতে-উঠতে এক পা থামে। বলে ফিসফিসিয়ে।

কেতকী মুচকে হাসে। ভাবখানা, না, কষ্ট কি। স্বামী ও তার

বন্ধুদের এত আনন্দের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি তাতে কষ্টের স্পর্শ কোথায় ? তা ছাড়া মাস-মাস ভাড়া পাচ্ছি না ? কষ্ট নিংড়েই সুখ। কষ্টের দুয়ারের বাইরেই আনন্দের সিঁড়ি।

বেশিক্ষণ কথা বলা বিপজ্জনক। কে কি শুনে ফেলে। কে কি মনে করে। খেলায় যতই মত্ত থাক, যখনই কেউ নামে-ওঠে, সিঁড়িতে ধারালো কান রাখে সুধাময়।

কথারই বা কি দরকার ? কি দরকার টর্চের ? অন্ধকারই কথা বলতে পারে। বাতাস যখন রুদ্ধ হ'য়ে যায় তখন সে রুদ্ধতাও কথা।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সুধাময় কেতকীর হাত চেপে ধরল। সারা গায়ে ছটফটিয়ে উঠল কেতকী।

'দাও, দাও. শিগগির দাও— এই শেষ সম্বল, শেষ খেলা—' ব'লে জোর ক'রে বাঁ হাত থেকে রুলিগাছটা ছিনিয়ে নিল সুধাময়।

যে শুধু হেরে যাচ্ছে তারই উপর আক্রমণ ? আর যে সব লুট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তার উপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না ? নখে-দাঁতে তাকে কেউ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে পারে না ? কেড়ে নিতে পারে না তার পকেটের পুঁজি ?

ডাকাতি করা কি চলে ? জুয়ো খেলেই নিতে হবে। কাঁটাই কাঁটার শোধ তুলবে।

সিঁড়ির উপর মাঝে-মাঝে থামে। দাঁড়িয়ে জিরিয়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা কয় ফিসফিসিয়ে। মাঝে-মাঝে কথা কয় না। একটুখানি বেশিক্ষণ থেমে থাকে।

গাছ কি ক'রে দক্ষিণ হাওয়াকে ডাকে কে জানে! হাওয়া লাগবার আগেই নিজের থেকে ন'ড়ে-চ'ড়ে ওঠে নাকি ?

এবার একবার বসুক না পাশটিতে।

সেই থামা-থামা ভারি-ভারি পা নেমে আসছে। নেমে আসছে।

কি আশ্চর্য, সিঁড়ির ধাপের উপর বসল পাশ ঘেঁষে।

যেন একটা বরফের গুহার মধ্যে কে ঠেলে ফেলল কেতকীকে। গাছ নেই, পাথর নেই, কিছুই একটা ধ'রে ওঠবার আগ্রহ নেই। সিঁড়ি নেই।

বাঁ হাতটা টেনে নিল আদরে। যে সোনার রুলিটা জিতেছে তাই পরিয়ে দিতে লাগল টিপে-টিপে।

না, বুক টিপটিপ করতে দেবে না। বরফই জল হবে।

হঠাৎ বুক-পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল কেতকী। বললে ফিসফিসিয়ে, 'শুধু রুলি ফিরিয়ে দিলে কি হবে? নগদ— নগদ টাকা চাই।'

পকেট-ভর্তি টাকা-নোট। এক মুঠো তুলে নিল কেতকী।

'অনেক- - অনেক আজ পেয়ে গেছি। তোমার সোনার রুলি আজ আমার ভাগ্য খুলে দিয়েছে।' বললে সুধাময়। 'তোমাকে বলেছি না, জুয়োয় যে জেতে সে শেষ পর্যন্ত জেতে না।'

হাত-ভর্তি টাকা-নোট পকেটের মধ্যে ছেড়ে দিল কেতকী।

ঘৃণা

একটি মুহূর্তের চকিততড়িৎ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে মার ঠিক করতে হবে। দশদিকে দশটা লোক বাঘের মতো থাবা পেতে আছে, আরেকটা দুর্দান্ত বিক্রমে বল ছুঁড়ছে মুখোমুখি। আর সে-বলে কত পাকচক্র, কত কূটকৌশল, কত উড়ন-ঘুরন। তোমাকে নস্যাৎ করবার জন্যে সর্ববিধ পার্থিব প্রতারণা। চক্ষের নিমিষে সিদ্ধান্ত এক চুল দেরি হয়েছে কি তুমি আউট হ'য়ে গিয়েছ।

সাধ্য কি ব্লক করো। ব্লক করতে তোমাকে দেবে কেন ? তোমাকে প্রলুব্ধ করবে।

আর ব্লক করাই ক্রিকেট নয়। টিঁকে থাকাই জীবন নয়।

'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না ?'

জগদ্দল পাথর-ভর্তি বাস-এ হঠাৎ সেদিন দেখা।

লেডিজ নেই, লেডিজ হবে না -- সমানে চেঁচাচ্ছে কণ্ডাক্টর। তবুও পাদানি ও দরজার ভিড় ঠেলে নিরঙ্কুশ ঔদাসীন্যে উঠে পড়ল সুকণ্ঠী। যেতে যখন হবেই তখন ভয়-ভবিষ্যৎ না ভেবেই যেতে হবে।

কিন্তু দাঁড়াবে কি ক'রে ? ধরবার অবলম্বন কি ? অবলম্বন বোধ হয় একটুমাত্র আশা কেউ তাকে সিট ছেড়ে দেবে।

আজকের যুগেও এমন আশা কেউ করে নাকি ? সমান স্বাধীনতা নিয়েছ সমান দায়িত্ব নেবে না ? আসরে নেমে আবার ঘোমটা টানা কেন ? দয়া চাও কোন লজ্জায় ? যদি ফুলের কুঁড়িই হবে হাটে-বাজারে রোদে-বৃষ্টিতে নেমেছ কেন ? হাট-বারে পাঠ নেই।

মহানুভব কে খুঁজছে? দু-একটা মিনিমুখো বোকাসোকা লোকও তো থাকতে পারে।

আশ্চর্য, আশার রাজ্যে পাথরেও ফুল ফোটে।

পাশের লোককে বিপন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল পরাশর। পাশের লোককে প্রসন্ন ক'রে ব'সে পড়ল সুকণ্ঠী।

যেখানে সুকণ্ঠীর নামবার কথা তার আরো তিনটে স্টপ পেরিয়ে পরাশরের বাড়ির গলি। তিনটে স্টপ পেরিয়েই নামল। বদান্যতার বদলে যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানায় না তার কেমনতর রীতি-নীতি!

নামতেই সুকণ্ঠী বললে, 'একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?'

এ কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি।

'গাড়ি কেনা মানেই তো যন্ত্রের অধীন হ'য়ে যাওয়া।' বললে পরাশর। 'তখন বাস-ট্র্যাম, ফার্স্ট ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস রিক্‌শা-সাইকেল—আনন্দময় পদব্রজ—সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হ'তে হবে। তা ছাড়া আজকের এই রোমাঞ্চ? তোমাকে এই সিট ছেড়ে দেওয়া?'

সুকণ্ঠী হাসল। বললে, 'তার চেয়ে একটা স্মুথ লিফ্‌ট্‌ পেলে বেশি সুখ।'

পরদিন অফিস-টাইমে সুকণ্ঠীর বাস-স্টপের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে সাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল।

পরাশর নামল গাড়ি থেকে। উন্মনস্ক সুকণ্ঠীর কাছে গিয়ে বললে, 'একটা গাড়ি আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিই। তোমার আপিস তো আমাদেরই পাড়ায়।'

গোটা চারেক বাস ছেড়ে দিয়েছে সুকণ্ঠী। এমন গণ্ডারের মতো ভিড় ছুঁচ গলাবারও সাধ্য নেই। তাম্রনেত্রে তাকিয়ে আছে পঞ্চমের দিকে। আর মনে-মনে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময়ে এই দৈবাগত নিমন্ত্রণ।

যেমন অভ্যাস, গায়ের আঁচল মৃদু শাসন ক'রে স্বকণ্ঠী বললে, 'মন্দ কি।' তারপর দু পা এগিয়ে গাড়ির সামনে এসে বললে, 'ট্যাক্সি!'

যেন খুব সম্ভ্রান্ত নয়, এমনি কটাক্ষ। ভাড়াটে-ভাড়াটে গন্ধ, কেমন যেন অকুলীন। তোকে দেখলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সি ক'রে যেতে, আপিসের কোনো মেয়ে যদি বলে, কেমন নিশ্চয়ই টোকো শোনাবে। তবু বদ্ধ গুমোটের মধ্যে এক ঝলক বাসন্তী হাওয়ার মতোই মহাত্রাণ এই ট্যাক্সি।

পরাশর বললে, 'অফিস-টাইমে এই ট্যাক্সি যোগাড় করাও বা কি কঠিন।'

আরো কঠিন, তাক বুঝে ঠিক সময়ের সূচ্যগ্রমুখে গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হওয়া। তার মানে কতক্ষণ আগে থেকে মিটার নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বকণ্ঠীদের গলির মোড়ে, কতক্ষণে দেখা যায় তার শাড়ির পাড়, তার ব্যাগের স্ট্র্যাপ, তার এগিয়ে-আসার ঢেউ।

স্বকণ্ঠী আগে ঢুকল ট্যাক্সিতে। পরে পরাশর।

কেমনতর হ'য়ে গেল। পরাশরের ডাইনে হ'য়ে গেল স্বকণ্ঠী। শুধু মুখ বাড়িয়ে ডাকত আর স'রে ব'সে জায়গা দিত, স্বকণ্ঠী বাঁয়ে থাকত। বাঁ-টাই সমীচীন, শাস্ত্র ও আইনসম্মত। আর, অনেক অভিজ্ঞতার ফল থেকেই আইন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট হ'য়ে হরিশ মুখার্জি রোডের মোড় ঘুরল ট্যাক্সি।

'ঘুরপথে চলতে বললেন কেন?' একটু কি কুণ্ঠিত হ'ল স্বকণ্ঠী।

'চৌরঙ্গিতে ক্ষণে-ক্ষণে শুধু রক্তচক্ষুর আস্ফালন।' একটু যেন ঘেঁষে বসল পরাশর: 'আর লাল চোখ যদি একবার তোমার দিকে তাকায়

বারে-বারেই তাকায়। তুমি একটা স্মুথ রান চেয়েছিলে, না ? জীবনে যদিও স্মুথ রান কোথাও নেই, তবু লাল চোখ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল।'

তবু পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসছে না সুকণ্ঠী। হাঁটু দুটো কেমন কাঠ ক'রে ব'সে আছে। কনুইটা কেমন কোণ-তোলা। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা পাশ থেকে সরিয়ে এনে বসিয়েছে কোলের উপর।

লোয়ার সার্কুলার রোড ঘুরে ক্যাজারিনা এভিনিউতে পড়েছে ট্যাক্সি।

চোখ না মেলেও দেখা যায়। চুপ ক'রে থেকেও কথা হয়। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে মুখ বুজে শুধু কাছাকাছি ব'সে থাকাও যে দেখা আর কথা বলা এ কে জানত।

সেদিনের সেই মফস্বলের মেয়েটিকে মনে-মনে আবার রচনা করল পরাশর।

এক বৃষ্টি-থামা সন্ধ্যায় লণ্ঠনের টানে ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকা এসেছে, নানা মাপের নানা রঙের পোকা। তাই ব'সে-ব'সে দেখছিল পরাশর আর ভাবছিল এত যেখানে পোকা তখন কে বলে এ পৃথিবী শুধু মানুষের জন্যে।

একজনের হাতে একটা মোটা খাতা, গোটা কয় কলেজের মেয়ে এসে হাজির।

ওদের মধ্যে যে মেয়েটি অচপল সে খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছি। আপনি যদি একটা লেখা দেন—'

স্বাস্থ্যে শ্রীতে ডগমগ মেয়েটি। যেন ঝকঝকে একটা করাতের পাত।

খাতাটা বাড়িয়ে দিল না হাতখানিই বাড়িয়ে দিল কে জিগগেস করবে।

উৎসাহে উথলে উঠছে। আগ্রহ দূরে থাক, এতটুকুও কৌতূহল দেখাল না পরাশর। খাতাটাও একবার দেখল না পৃষ্ঠা উলটিয়ে। নিহাস্য গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি তো কবিতা লিখি। আর সে শুধু প্রেমের কবিতা।'

'লিখবেন।' এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না মেয়েটি।

মুখের দিকে তাকাল পরাশর। দেখল লজ্জার গাঢ় পদ্মরাগ সুকণ্ঠীর চোখের কোণে বিশ্রাম করতে বসেছে।

সে কবিতা আর লেখা হয় নি। সে পত্রিকা মুছে গেছে। সমস্ত শহরটাই মুছে গেছে মানচিত্র থেকে।

কিন্তু মনের চিত্র থেকে মুছে যায় নি সেই মেঘমাখানো সন্ধ্যা, সেই মিটিমিটি লণ্ঠনের আলোয় অনেক পোকার মধ্যে একটি মানুষী প্রজাপতি। আর রক্তে-মাংসে যে-প্রেমের কবিতা লেখা হবে না তারই অব্যক্ত গুঞ্জরণ।

আকাশের দেশ নেই, প্রেমেরও বয়স নেই।

ফেলে-আসা গাঁ-শহরের অধিবাসীদের মাঝে-মাঝে সভা হয়, একত্র মেলামেশার জন্যে। যেহেতু এককালে সে-শহরে পরাশর অধিষ্ঠিত ছিল এবং সৌহার্দ্যে সকলের সঙ্গে প্রায় একাত্ম ছিল, তারও নিমন্ত্রণ হ'ল।

তেমনি এক সভায় সুকণ্ঠীর সঙ্গে দেখা।

'আমাকে চিনতে পারেন ?' সুকণ্ঠীই এসেছিল এগিয়ে।

'তুমি, তুমি সেই সু, সু—শরীরের কি যেন একটা অংশ—সুদতী, সুভ্রূ, উঁহু, সুকেশী— না, না, সু— সুকণ্ঠী নও ?' রক্তিম উত্তেজনায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল পরাশর।

'আশ্চর্য, এখনো মনে আছি দেখছি।' স্থকণ্ঠী চোখ নামাল না।

'ঠিক বলেছ, মনে আছে নয় মনে আছি।' দর্শনের মধ্যে স্পর্শনের স্থর মেশাল পরাশর: 'ধনে-জনে স্থখ নেই, মনেই স্থখ।'

তাজা ডগালে শাকের মতো লকলকে ছিল, এখন একেবারে দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। দয়াহীন দারিদ্র্যের ঝড় দাগ ফেলে-ফেলে ব'য়ে গেছে দেহের উপর দিয়ে তা ঠাহর করলেই বোঝা যায়। কাছে ব'সে কথা ক'য়ে কিছু খবরও জানা গেল, সেই পুরোনো খবর। বাবা উকিল ছিলেন, বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে থাকতে পারলেন না। কিছুই আনতে পারেন নি, বাড়িঘরেরও খদ্দের নেই। এখানে কে চেনে, প্র্যাকটিস জমাবার কথা ভাবাও পাগলামি। তবু দুপুরে, ঘুমে-গরমে প'চে মরার চাইতে আদালতে ঘোরাফেরা করেন, অন্ধিসন্ধি যদি এক-আধটা মিলে যায় কখনো। দুখানা ঘরে যে একটা বাসা নিয়েছেন তাকে একটা বাক্স বললেই ঠিক হয়। যা চাকরি একা স্থকণ্ঠীই করছে। তার সঙ্গে একটু রাজনীতি বা কাজনীতি না মিশিয়েই বা উপায় কি। ফোকটে যদি দুটো টাকা মাইনে বাড়ে সে ফিকির কে না দেখে।

'তোমার পিঠ-পিঠ যে ভাই ছিল সে কি করছে?'

'ভুগছে।'

'অস্থখ?'

'রাজ-অস্থখ। রাজযক্ষ্মার চেয়েও মারাত্মক।'

'সে কি?' চমকে উঠেছিল পরাশর।

'হ্যাঁ, সে অস্থখের নাম বেকারি। সমর্থ ছেলে, বি-এ পাস, একটা চাকরি জুটছে না।'

বিয়ে যে হয় নি তা তো হাতে-মাথেই বোঝা যাচ্ছে। কি ক'রেই বা হবে? সময় কই? স্বাস্থ্য কই? টাকা কই?

একজনের চোখের উঠোনে আরেকজনের চোখের রোদ খেলা করেছিল অনেকক্ষণ।

যে ছবির চোখ একবার তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছে তাকে দূরে-সামনে যে কোণ থেকেই দেখ না কেন, সব সময়েই সে তাকিয়ে থাকবে চোখের দিকে। তেমনি যাকে একবার ভালো লেগে গিয়েছে, সব অবস্থাতেই সে জাগিয়ে রাখবে সেই ভালোলাগার আলো— যে আলো মাটিতেও নেই সমুদ্রেও নেই।

সভা শেষে, ভেঙে যাবার আগে আবার একটু দেখা হ'ল। এ ওর ঠিকানা বললে। এত কাছে? অলক্ষ্যে যেন আরো একটু কাছাকাছি হ'ল। একদিন যেয়ো না। তোমার ভাইকে— কি না জানি নাম— ধ্রুবজ্যোতিকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। দেখি কি করতে পারি।

ভাইকে কিছু বলে নি, নিজেই একদিন দেখা করতে গিয়েছিল সুকণ্ঠী।

একটা প্রকাণ্ড একান্নবর্তী বাড়ি, বড়ো-ছোটো অনেক আত্মীয়-পরিজন নিয়ে একত্র আছে পরাশর। ভাড়াটে বাড়ি, এখানে-ওখানে অনেকগুলি কোঠায় অনেক শিশু বুড়ো ছোকরা-ছুকরির হিজিবিজি।

'নিজের একটা আলাদা বসবার ঘর নেই তাই এস এই প্যাসেজটাতেই বসি।' বললে পরাশর।

'থাকেন কোথায়?'

'মানে শুই কোথায়? ঐ তেতলার এক কোণে। অদৃষ্টে কোনো রকমে জুটেছে একখানা।'

'আলাদা একটা ফ্ল্যাট নেন না কেন?'

'একের পক্ষে পাঁচজনের মানে পাঁচের পিঠে চ'ড়ে একান্ন হওয়াই সুবিধে।'

সুকণ্ঠী হাসল, কিন্তু আলাপ জমল না। কেমন বাজার-বাজার আপিস-আপিস শোনাল। কত মাইনে সুকণ্ঠীর, বাড়তি-আদায় কিছু আছে কি না, মরা নদীতে কি ক'রে চালায় গাধাবোট— এই সব। পরাশর আরো কত উঠেছে মই বেয়ে, আকাশ প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়— ছি ছি, তার হিসেব।

কি রকম যেন প্রার্থী-প্রার্থী মনে হ'ল নিজেকে। সুকণ্ঠী উঠে পড়ল।

'কই আমাকে একদিন যেতে বললে না তোমাদের বাড়ি?' পরাশর এগিয়ে দিল দু পা।

'তবু তো আপনাদের বাড়িতে একটা প্যাসেজ আছে বসবার, আমাদের বাড়িতে তাও নেই।'

'ভালোই তো। পথেই তা হ'লে আমাদের ঘর-দোর।'

ট্যাক্সি রেড রোডে পড়েছে।

গতিটাকে একটা গভীর শান্তির মতো মনে হ'ল পরাশরের। প্রগাঢ় নিষ্ক্রিয়তার শান্তি। গল্পটা কিভাবে শেষ হবে মনে যখন ঠিক-ঠিক এসে যায় তখন লেখকের যে শান্তি সেই শান্তি সুকণ্ঠীকে এখন পাশে নিয়ে। মনে-মনে লেখার সমাপ্তি খুঁজে পাবার পর যেমন আর লিখতে ইচ্ছে করে না তেমনি যেন ওকে নিয়েও পরাশরের আর কিছু ইচ্ছে নেই।

সামান্য একটা ফুল ফোটাবার জন্যে মৃত্তিকার কত দীর্ঘ ও ধীর আয়োজন চলে। মানুষেরই ধৈর্য নেই, আয়ু নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

'কই তোমার ভাই তো এল না।'

'আমি ওকে বলি নি কিছু—'

'সে কি ? আমার আপিসে কত দিক থেকে কত রকম ভেকেন্সি হয়—'

'ওর হবে না। আর যখন হবে না তখন আমার কাছে ও আপনার নিন্দে করবে। আপনাকে অযোগ্য অক্ষম বলবে। এ আমি সইতে পারব না।'

সুকণ্ঠীর বাঁ হাতখানির দিকে তাকাল পরাশর। দুর্বল, দরিদ্র, পরিত্যক্ত। আস্তে-আস্তে ধরবে না ছোঁ মেরে তুলে নেবে ভাবতে লাগল।

পরিশ্রমের কাঠিন্যে লেখা ঔৎসুক্যের নরম কবিতা।

পরাশরের হাতের মধ্যে সুকণ্ঠীর হাতখানি ভয়ে কুঁকড়ে রইল। বিস্কুটের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

খটখটে রোদ, দু-দিক থেকেই ধাবন্ত মোটর। আগাপাশতলা-বোঝাই একটা এক্সপ্রেস দোতলা বাস কাটিয়ে গেল ট্যাক্সি।

'আপিস থেকে ফিরতে তোমার বুঝি খুব দেরি হ'য়ে যায় ?'

'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গানের টিউশানি থাকে।'

'তোমার গলা কি আশ্চর্য সুন্দর, যেন সোনা ঢালা—'

প্রশংসা করলে কোন মেয়ে না সুখী হয় ? তবু সুকণ্ঠী, খুশি হ'য়েও হাতের দিকে কড়া নজর রেখেছে। হাত নিয়েই পরাশর শান্ত থাকে কি না, না এলাকার বাইরে চ'লে আসে। শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললে, 'চর্চাই করতে পারি না। পাবলিসিটি নেই—'

পুরুষের স্বভাব কি কিছুতেই যাবে না ?

হাত ছেড়ে দিয়েছে হাত। কাঁধের উপর উঠে এসেছে।

মুহূর্তে পরাশরের সান্নিধ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কোণে ছিটকে প'ড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে উঠল সুকণ্ঠী : 'এই, রোকো। রোকো—'

এমনটি কোনোদিন শোনে নি ড্রাইভার। গাড়ি আস্তে করল।

একটা টুকরো-করা সেকেণ্ডের এক কণিকা ভুল হয়েছে মারে। পিচে বল পড়বার আগেই ব্যাট হাঁকড়ে বসেছে।

কিন্তু তাই ব'লে শালীনতাকে বিসর্জন দেওয়া কি উচিত হবে? বর্বরতার প্রতিরোধে আবার শালীনতা কি। তবু ব্যাণ্ডেজটা সিল্কের হওয়াই তো ভালো। ব্যাণ্ডেজ কোথায়? এ দগদগে ঘা।

পরাশর সহজ হবার চেষ্টায় বললে, 'এইখানে নেমে পড়লে বিপদে পড়বে যে।'

'না, আমি এইখানেই নামব। পায়ে হেঁটে যাব।' কোণের কাছে লেপটে গিয়ে সুকণ্ঠী দুঃখে রাগে থরথর ক'রে কাঁপছে।

'এখানে ট্যাক্সি কোথায়? বাস কোথায়? হঠাৎ নেমে পড়লে চলতি গাড়ির লোকেরা ভাববে কি।'

'অন্যে কি ভাবে ব'য়ে গেল। আমি কি ভাবছি তা কে ভাবে।' মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বসল সুকণ্ঠী: 'এই, রোকো। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।' ব্যাগ হাটকাতে বসল নিচু হ'য়ে।

'এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চলো, নামিয়ে দেব। সেটাই ডিসেণ্ট হবে। সেখানে বাস-ট্র্যাম যা হোক কিছু একটা পেয়ে যাবে সহজে।' নিশ্চল নিরুদ্বেগ মুখে বললে পরাশর।

বিপদে বুদ্ধি হারানো কাজের কথা নয়। এটুকু পথ রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধতায় সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। গায়ের আঁচল ঘন ক'রে বসল সুকণ্ঠী।

তাই এখনো বিয়ে করে নি। এমনি উড়ে-ঘুরে বেড়াবার মতলব। বলে, যন্ত্রাধীন হব না। বাস ট্র্যাম ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস রিক্শা

সাইকেল—যখন যা হাতের কাছে চ'লে আসে তাই লুফে নেবে। কিন্তু আমি ছ্যাকরা গাড়ি নই।

চিত্তরঞ্জনের মোড়ের কাছে ট্যাক্সি থামল। ঝটকা মেরে নেমে পড়ল সুকণ্ঠী।

পরাশরকে খানিক এগিয়ে গিয়ে নামতে হ'ল। কি না জানি ক'রে ফেলে মেয়েটা। নখে-দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি, ট্র্যাম-বাসের তলায় না ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেলেঙ্কারির ভয় ব'লে বালাই কিছু আছে ব'লে তো মনে হয় না। কে জানে, হয়তো যা রেওয়াজ হয়েছে আজ-কাল, থানায় না ডাইরি ক'রে বসে।

না, সুস্থ-শান্ত ভঙ্গিতে তেরো নম্বর বাসেই উঠল সুকণ্ঠী। পরাশর আরেকটা ট্যাক্সি নিল।

সন্ধ্যায়ও রাগ মরে নি সুকণ্ঠীর। বাড়ি ফিরে এসে ছোটো অ্যাটাচি কেসটা খুলে বসল। দৈনিক পত্রিকার ক'টা কাটিংস জমিয়েছিল সুকণ্ঠী, যেখানে-যেখানে পরাশরের বক্তৃতার সারাংশ বেরিয়েছিল তার টুকরো। ক'টা ছবি। ক'টা বিজ্ঞাপন। অন্যের থেকে ভিক্ষে ক'রে আনা অটোগ্রাফের পৃষ্ঠা।

ধারালো নখে সব ছিঁড়তে বসল সুকণ্ঠী। টুকরো-টুকরো ক'রে। তাতেও জ্বালা মিটছে না। ছেঁড়া অংশগুলি আবার ছিঁড়ল, কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ল। মনে-মনে ভাবল অনেক বেঁচে গিয়েছি—এক-একবার ইচ্ছে হ'ত চিঠি লিখি—ভাগ্যিস লিখি নি। জঞ্জাল জড়ো করি নি বেশি।

দেশলাইয়ের কাঠি জেলে পোড়াতে বসল সে ছিন্নস্তূপ।

সেদিন খবরের কাগজ খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল বড়ো অক্ষরে কি একটা সংবাদ বেরিয়েছে পরাশর সম্বন্ধে। চোখে পড়তেই ঝলসে

উঠল। পরে ভাবল, কোনো কেলেঙ্কারির সংবাদ হয়তো। কিংবা কে জানে, হয়তো মোটর চাপা পড়েছে। নয়তো বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা। প'ড়ে দেখতে ক্ষতি কি।

বিপরীত সংবাদ! কতক্ষণ পরেই দুটি ছোকরা এসে হাজির। আমাদের সভায় আপনি যদি দুটি গান গান।

উৎফুল্ল হ'ল সুকণ্ঠী। এভাবেই তো পাবলিসিটি হবার সুযোগ। বললে, 'আপনারা কারা?'

কতদিনের পুরোনো ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তার বিবরণ দিল ছোকরারা। কারা-কারা সব সভাপতি হ'য়ে গিয়েছেন, দৈর্ঘ্যে পরিধিতে কত বড়ো সব জাঁকালো জাঁদরেল। কত ফিল্ম-স্টার, রেডিওআর্টিস্ট গান গেয়েছেন এখানে, কত নৃত্যভারতী দেখিয়ে গিয়েছেন ললিতকলা।

'কিসের সভা?'

'আমরা পরাশর রায়কে সংবর্ধনা দিচ্ছি।'

'কে পরাশর রায়?'

'সে কি কথা? এত বড়ো একজন সাহিত্যিক, জনপ্রিয়তার সব-চেয়ে উঁচু চুড়োয় যার বাসা—'

'ও, শুনেছি বটে।' মুখ গম্ভীর করল সুকণ্ঠী: 'কিন্তু এও শুনেছি লোকটা অত্যন্ত বাজে, রোথো, থার্ড ক্লাস—'

'চামড়া ও চরিত্র যার-যার নিজের ব্যাপার।' এক ছোকরা হাই তুলল, আরেক ছোঁড়া তুড়ি মারল: 'ও সব কে দেখে? দেশ সম্মান দেবে প্রতিভাকে।'

'মাপ করুন। যার-তার সভায় গান গাইতে পারব না।' রাগে পুড়তে লাগল সুকণ্ঠী।

এত বড়ো একটা পাবলিসিটির সুযোগ এমনি ক'রে গোল্লায় পাঠাবে ? প্রসাদের ফুলকে এমনি ক'রে পায়ে দলবে ? উপায় কি তা ছাড়া ? গানের চেয়ে মান বড়ো।

বলে কিনা গলা যেন সোনা-ঢালা। যদি পারতাম, গালাগাল দিয়ে সিসে-ঢালা ক'রে দিতাম।

একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে হঠাৎ সেদিন দেখা। কোন এক দূরসম্পর্কিত লোকের বাড়িতে কাজ, সেখানে ও লোকটার নিমন্ত্রণ হ'তে পারে কে জানত। সম্পর্কের কত শেকড় যে চারদিকে ছড়িয়েছে তার ঠিক নেই।

গদ্‌গদকণ্ঠে শোকভক্তি-ঢলঢল গান গাইছিল সুকণ্ঠী। সবাই তন্ময় হ'য়ে শুনছে। জমাট হ'য়ে আছে স্তব্ধতা। এমন সময় ঘরে ঢুকল পরাশর।

মুহূর্তে গান গেল থেমে। সুকণ্ঠী হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। বাতাস যেন উড়ে গিয়েছে ঘর থেকে। গা-মাথা কেমন ঘুরতে লেগেছে। সাঁ ক'রে ছুটে চ'লে গিয়েছে পাশের ঘরে। বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকে মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে।

কি হ'ল, ডাক্তার ডাকো। ভিড় সরিয়ে দাও।

পরাশর বেরিয়ে গেল।

না, সুস্থ হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির বাইরে এসে শুনতে পেল পরাশর, সুকণ্ঠী আবার গান ধরেছে।

'আপনারা একজন ঠিক করুন। হয় গাইয়ে নয় বলিয়ে।' প্রোগ্রামটা হাতে ক'রে ছুঁলও না সুকণ্ঠী। উপর-উপর চোখ বুলিয়েই বললে।

'আপনার সঙ্গে বক্তার ক্ল্যাশ হচ্ছে কোথায় ?'

'ভীষণ হচ্ছে। আপনাদের রুচির সঙ্গে হচ্ছে।' ঝাঁজিয়ে উঠল সুকণ্ঠী।

'কিন্তু পরাশরবাবুর নাম যে কার্ডে ছাপা হ'য়ে গেছে। ওঁকে এখন বাদ দিই কি ক'রে?'

'তা হ'লে আমাকে বাদ দিন। আমার নাম, গায়কের নাম তো আর ছাপা হয় না।'

'ওরে বাবা, আপনাকে বাদ দিলে সভা তো ফাঁকা মাঠ। আগে গাইয়ে পরে কইয়ে।'

'তা হ'লে যে সভায় ওরকম সভাপতি সে সভায় আমি গাই না।'

মাথা চুলকোতে লাগল ছোকরারা। 'তা হ'লে কি ক'রে ম্যানেজ করা যায়?'

'খুব যায়। নিতে লোক পাঠাবেন না। লোক না পাঠালে যায় কখনো সভাপতি? নিজের থেকে গাড়ি ভাড়া ক'রে?'

'তা মন্দ বলেন নি। লোকই পাঠাব না। আর এদিকে সভায় ঘোষণা ক'রে দেব হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। কিংবা বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে থেঁতলে-থেঁতলে কাটার মধ্যেও আনন্দ আছে।

জামা-কাপড় প'রে তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। লোক যাবে না। থেকে-থেকে শুধু মোটরের হর্ন শুনবে। একটাও দাঁড়াবে না দরজায়। হদিসও পাবে না কেন এই প্রত্যাখ্যান।

ধারালো অস্ত্রের উলটো পিঠ দিয়ে ফাটিয়ে-কাটিয়ে মারার মধ্যেও সুখ কম নয়।

'দিদি, আমার একটা চাকরি হয়েছে।' ধ্রুবজ্যোতি চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল।

'বলিস কি ?' আনন্দে প্রায় পাখা মেলল সুকণ্ঠী : 'কত মাইনে?'

'স্টার্টিং তো ভালোই। প্রায় আশাতীত। একশ' কুড়ি টাকা।'

'সত্যি ?' ভাইকে প্রায় আদর করে সুকণ্ঠী : 'কোথায়, কোন আপিসে ?'

আপিসটার নাম করল ধ্রুব।

'কি ক'রে পেলি ?'

'অ্যাপ্লাইও করি নি, কোথায় আবার খোঁজ পাব! পরাশরবাবু নিজের থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিলেন।'

'কে ?' যেন হুঙ্কার ক'রে উঠল সুকণ্ঠী।

'পরাশরবাবু। সেই যিনি— সেই যে—'

জ্বলন্ত একটা উনুন নিবে গিয়ে তাতে যেন গোবর লেপা হ'য়ে গেল। সুকণ্ঠী গলা মোটা ক'রে বললে, 'ওখানে তোমার চাকরি করা হবে না, ধ্রুব।'

'কেন ?'

'ওখানকার অ্যাসোসিয়েশন ভালো নয়।'

পেটের ভাত প্রায় চাল হ'য়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। ধ্রুবজ্যোতি মন খুলে হাসল। বললে, 'চাকরির আবার অ্যাসোসিয়েশন! ভূতের আবার জন্মদিন!'

'পরাশরবাবু লোকটা শঠ, ভণ্ড, জঘন্য—' যেন শব্দসম্পদ বেশি নেই সুকণ্ঠীর। অসহায়ভাবে হাত ছুঁড়ল শূন্যে। বললে, 'ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।'

'সূচনায় এটা কি তারই পরিচয় দিচ্ছে ?'

'যারা প্রতারক তারা সূচনায় এমনি ছদ্মবেশ পরে। ভালো করবার ছলে সর্বনাশ করে। চাকরি দিয়েছে গূঢ় কোনো শত্রুতার উদ্দেশ্যে।'

'এরকম শত্রুর সংখ্যা দেশ জুড়ে বৃদ্ধি পাক।' আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল ধ্রুব : 'বেকারির নিপাত হোক।'

'তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ও এই সুযোগে এই বাড়িতে আনাগোনা শুরু করবে।'

'বলো কি, আসবে আমাদের বাড়ি?'

'আসবে? এলে মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দেব না?'

'সে কি কথা? তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'শুধু ঝগড়া হ'লেই কি দরজা বন্ধ ক'রে দেয়?'

'তবে কোনো দুর্ব্যবহার?' চিরুনি ছেড়ে দিয়ে শুধু আঙুলে মাথা চুলকোতে লাগল ধ্রুব।

'ধ্রুব!' গর্জন ক'রে উঠল সুকণ্ঠী : 'যদি এ চাকরি তোমার করতেই হয় তবে এ বাড়িতে তোমার থাকা হবে না ব'লে দিচ্ছি। হয় তুমি আলাদা নয় আমি আলাদা হ'য়ে যাব। কালসাপকে বাস্তুসাপ হ'তে দেব না।'

বাবা এসে মাঝে পড়লেন। ধীরস্তত্র না মূহ্যতি। তিনি বললেন, 'আগেই দড়িকে সাপ ভাবা কেন? আর সাপ ফণা তুললেই বা ভয় কিসের? পাথর হ'তে পারলে সাপের ছোবলে কি হবে!'

পাথরই হ'তে হবে। বাড়ির সঙ্গে ছিন্ন করতে হবে সম্পর্ক।

কোথাও কোনো একটা মেয়ে-হস্টেলে জায়গা পায় কিনা তারই জন্যে ঘোরাঘুরি করছে সুকণ্ঠী। ঠিকানাটা না বদলানো পর্যন্ত শান্তি নেই। শুধু বাড়ির ঠিকানা নয়, পাড়া, মহল্লা, বাস-রুট। কোনদিন ধ্রুবর খোঁজে বাড়িতে এসে ওঠে চোরের মতো তার ঠিক কি।

'জানো দিদি, পরাশরবাবু প'ড়ে গিয়েছেন।'

সুকণ্ঠী মুখ ফিরিয়ে রইল। কত লোকই তো পড়ে-মরে তাতে কার কি মাথাব্যথা !

'সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে স্লিপ করেছেন।'

'মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে ?' রি-রি ক'রে উঠল সুকণ্ঠী।

'অতটা হয় নি। পায়ে চোট লেগেছে—'

'ঠ্যাং খোঁড়া হ'য়ে যায় নি ?'

'বলা যায় না কি হয়।'

'অমন লোকের অমন কিছু না হ'লে প্রকৃতির নিয়ম ব'লে কিছু থাকে না।' সুকণ্ঠী সর্বজ্ঞ দার্শনিকের মতো বললে।

'হাসপাতালে আছেন। এক্স্‌রে রিপোর্ট পেলে তবে বোঝা যাবে।'

এই, এই হচ্ছে অসুবিধে। রোজ তার খবর সরবরাহ করছে ধ্রুব। এমনি ক'রে তার অস্তিত্বের শারীরিক অনুভবটা বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন চলেছে।

'বিশেষ ভাবনার কিছু নেই বলেছে ডাক্তার। সিম্পল ফ্র্যাকচার। প্ল্যাস্টার ক'রে দিয়েছে। মাসখানেকের ধাক্কা।'

'মোটে ?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সুকণ্ঠীর। উষ্মাটা যে চাপা দেবে চট ক'রে এমন কোনো কথা খুঁজে পেল না।

'আজ আবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম—'

'যেখানে খুশি তুমি যাও, চুলোয় হোক গোল্লায় হোক নরকে হোক—আমাকে জানাবার কোনো দরকার নেই। হাসপাতালে রুগী খালি একটা নয়।'

'জানো দিদি,' সেদিন বিমর্ষ মুখে ধ্রুব এসে বললে, 'পরাশরবাবু আমাকে বাইরে বদলি ক'রে দিয়েছেন—'

উত্তরে জিগ্‌গেস করা উচিত, কোথায় ? কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে সুকণ্ঠীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : 'বাঁচলাম !'

'বাঁচলে ?'

'তা ছাড়া আবার কি। সব সময় আর খবর যোগান দেওয়া চলবে না। গায়ের জ্বালার নিবারণ হবে।'

ধ্রুব গেল বাবাকে বলতে। রামমোহনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মফস্বলে গেলে তো বিষম ক্ষতি। কিছুই তখন তুলে তো পাঠাতে পারবে না সংসারে।

'না, না, একা থাকতে শেখাই তো ভালো।' সুকণ্ঠী সহজ-স্পষ্ট স্বরে বললে, 'আত্মীয়দের আঁকড়ে ধ'রে কোনো রকমে মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকায় কোনো বাহাদুরি নেই। খোলামেলা জায়গায় স্বাবলম্বনের স্বাধীনতায় থাকা অনেক ভালো।'

এ একটা কাজের কথা হ'ল ? যে ক'রে হোক এ বদলি রদ করাতে হবে।

'তুমি একবারটি যাবে দিদি ? তুমি যদি একটু বলো—' মিনতিম্লান মুখে ধ্রুব কাছে এসে দাঁড়াল।

'আমি ? আমি যাব ?' বোমার মতো ফেটে পড়ল সুকণ্ঠী।

বুঝতে পেরেছি, মনে-মনে গণনা করতে বসল, সব কারসাজি। চাকরি দেওয়া বদলি করা তদবিরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সবই শাণিত ষড়যন্ত্র।

অগত্যা রামমোহনবাবু ছেলেকে নিয়ে নিজে গেলেন দরবার করতে।

'বাবা, তোমার যাবার কি হয়েছে ? তুমি কেন ছোটো হ'তে যাবে ?' সুকণ্ঠী বাধা দিতে এল।

রামমোহনবাবু শুনলেন না। শুধু বললেন, 'আমার তো মনে হয় দিতে জানাটাই চালাকি নয়, নিতে জানাটাও চালাকি।'

মফস্বলই যেন বহাল থাকে। রাগে জ্বলতে লাগল সুকণ্ঠী। এত কথা তা হ'লে উঠতে পায় না সংসারে। পরাশরের জ্বলন্ত স্মারক চিহ্নের মতোই যেন জেগে আছে ধ্রুব। সব সময়ে যেন তারই সমৃদ্ধি আর ঔদ্ধত্যের গন্ধ ব'য়ে বেড়াচ্ছে। ও চ'লে যাক, স'রে যাক চোখের সামনে থেকে। নিত্যনতুন কথার নিবৃত্তি হোক, মনে-জাগিয়ে-রাখার ঘা শুকোক। গা-জুড়োনো হাওয়া দিক।

'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল দিদি।' ধ্রুব ফিরে এসে বললে, 'বদলি কিছুতেই রদ করতে রাজি হলেন না।'

'আমার কথা কিছু বলেছিলে বুঝি?' যেন মাথার উপর খড়্গ তুলল সুকণ্ঠী।

'না, তোমার কথা বলতে হয় নি। কিন্তু মনে হয় বুঝতে পেরেছেন। নইলে প্রায় ঐ কথাগুলিই বললেন কি ক'রে?'

'কোন কথা? কোন কথা আবার বলেছিলাম আমি?'

'বললে, আত্মীয়দের আঁকড়ে মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। ওরকমভাবে থাকতে গেলেই নানারকম ক্ষুদ্রতা, নানারকম কলহ। বিরোধের মধ্যে আলাদা হ'লে জোড় লাগে না, কিন্তু এমনি আলাদা থাকতে শিখলে আত্মীয়রা আলাদা হয় না।'

'এ সব আমি কিছু বলি নি। এ সব মোটেই আমার মনের কথা নয়।' চাপা আক্রোশে গজরাতে লাগল সুকণ্ঠী: 'তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের জব্দ করা, নাকাল করা, আমাদের সংসারের আয় কমিয়ে দেওয়া—'

ধ্রুব কান চুলকোতে লাগল।

কে জানে হয়তো বা দুর্বল, অভিভাবকহীন ক'রে ফেলা। হাতের কাছে একটা খাটিয়ে-পিটিয়ে ভাই ছিল, উঠতে-ছুটতে পারত, তাকে সরিয়ে দেওয়া। মনে-মনে আবার গণনা করতে বসল সুকণ্ঠী। গভীর, সুগভীর ষড়যন্ত্র।

রাগে-রোষে দগ্ধ হ'তে লাগল সুকণ্ঠী। কোথায় শীতলসিঞ্চন আছে, মনোহর সরোবর আছে যেখানে ডুবতে পারলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, মনের জ্বালা যায়।

বৃষ্টি, বৃষ্টি নামল সেদিন। আপিস-আদালত ভাঙো-ভাঙো, এমন সময়।

একটা সমুদ্রকে যেন আকাশে তুলে এনে সহসা উপুড় ক'রে দিয়েছে। বৃষ্টিতে ফোঁটা থাকে, রেখা থাকে, দুটো রেখার মধ্যে খানিকটা বা ফাঁক থাকে। এ বৃষ্টির মধ্যে কোনো ফোঁটা নেই রেখা নেই ফাঁক নেই। এক সমুদ্র জল একসঙ্গে নেমে পড়েছে। যেন বাঁধ-ভাঙা বন্যা, কারু ধার-না-ধারা ধারাপাত।

আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুকণ্ঠী। তাড়াতাড়ি একটা বাস ধরতে হয়।

প্রায় ছুটে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাস কোথায়? যা দু-একটা আসছে গন্ধমাদন হ'য়ে আসছে। হাত তুললেও দাঁড়াচ্ছে না। ভিতরের তাগিদে যদি বা কখনো দাঁড়াচ্ছে, পিলপিল ক'রে লোক ছুটছে হানা দিতে। পৌঁছুবার আগেই ভিজে একসা হ'য়ে যাচ্ছে। তারপর আবার ফিরে আসছে স্বস্থানে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সুকণ্ঠী। মুষলধার শুনেছে, এ শতঘ্নীধার। কোথাও বিরাম নেই, দয়ামায়া নেই। কি ক'রে বাড়ি ফিরবে ভেবে কূল পাচ্ছে না। নিঃসহায় দুশ্চিন্তায় সমস্ত শরীর ভারি হ'য়ে উঠেছে।

জলের শাদা পর্দা যেমন ঘিরে আছে শূন্যকে, তেমনি সুকণ্ঠীকে ঘিরে আছে আতঙ্কিত অনিশ্চয়।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সি— বহুজনের সঙ্গে সুকণ্ঠীও হাত তুলল।

ভালো ক'রে দেখে নি কেউ, একটা লোক আছে ভিতরে। সবাই নিরস্ত হ'ল কিন্তু ট্যাক্সি নিরস্ত হ'ল না। সুকণ্ঠীর কাছে দাঁড়াল, কার্ব ঘেঁষে। দরজা খুলে দিল ভিতর থেকে। আর, আশ্চর্য এক মুখ হাসি নিয়ে ভিতরে ঢুকল সুকণ্ঠী।

উঠতে-উঠতে বললে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে।'

'বর্ষায় সমস্ত হিসেব মুছে যায়। কুম্ভকর্ণের মতো অসম্ভবেরও ঘুম ভাঙে।' বললে পরাশর।

'হবে।' দরজা বন্ধ করল সুকণ্ঠী।

বেশ মেলে-ঢেলেই বসেছে মাঝখানে। ভঙ্গিটা আর কাঠ-কাঠ নয়, কাঠগোলাপ-কাঠগোলাপ। বেশ অনায়াসেই ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল পরাশর।

'ভিজে গিয়েছ দেখছি।'

'ও কিছু নয়—'

জনে-যানে যে শহর ঝলমল করছিল সে কেমন এখন অন্যরকম হ'য়ে গিয়েছে। অবাস্তবতার ছায়ামাখানো অন্যরকম পোশাক পরেছে। বাড়িঘরের দরজা-জানলা বন্ধ, যেন কোন পরিত্যক্ত পাষাণের রাজ্য। দোকানের সাইনবোর্ডগুলি যেন অন্য কি কথা কইছে, অসময়ে যে ক'টা আলো জ্ব'লে উঠেছে তা যেন কোন অনির্দেশের হাতছানি। লোকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে বা যারা পথ ভাঙবার চেষ্টা করছে সব আরেক কোন অজানা দেশের বাসিন্দে। সবাই কেমন অসতর্ক,

অন্যমনস্ক। কিছু আসে যায় না, সবাই কেমন নিয়মের বাইরে, নিষেধের বাইরে, রুল-টানা রুটিনের বাইরে।

ট্যাক্সি থেমে পড়ল। আর যাবার পথ নেই।

জলে জলময় রাস্তা। রাস্তা তো নয়, ডহরপানির খাল। দস্তুরমতো ঢেউ দিয়েছে, আশেপাশের দোকান বাড়ির দেয়ালে গিয়ে লাগছে। কোমরডুব জল ঠেলে যাচ্ছে কেউ-কেউ, ছেলেরা নৌকো ভাসিয়েছে. কাগজের, কাঠের। কেউ-কেউ বা সাঁতার কাটছে, জল নিয়ে ছোঁড়া-ছুঁড়ি করছে। এখানে-ওখানে বিগড়ে আছে মোটর। বোঝাই হ'য়ে রিক্‌শা চলেছে ছপ্পর তুলে।

'কি বিপদই না হ'ত ট্যাক্সিটা না পেলে।' বললে সুকণ্ঠী।

'বিপদ তো এখনও।' বললে পরাশর। 'ট্যাক্সি আর যাবে না। এঞ্জিনে জল ঢুকেছে। কতক্ষণে জল নামবে ট্যাক্সি চলবে কে জানে।'

তবু যেন এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই সুকণ্ঠীর। এই অজস্র বর্ষণ, পথঘাট ডোবানো বাড়িঘর ভোলানো জল, এই অনিশ্চয়ে থেমে থাকা—কিছুই যেন দুরূহ নয়।

কলকাতাই যেন নয় আর কলকাতা। যেন কোন আরেকটা জায়গা। নদীর ধারে একটা নৌকো বাঁধা। একটা ছাতিম গাছ ভিজছে নিঝুম হ'য়ে। কোথায় ব'সে কাঁদছে একটা নিরালা পাখি।

যেন এটা বাড়িফেরা কেরানির বিকেল নয়, ঘুমে-অঘুমে মেশা মস্ত মধ্যরাত।

আ ঘ্রা ণ

ঝড়ের বাড়িখাওয়া পথহারা পাখির মতন মেয়েটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেঝের উপর ব'সে পড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল, তাও দেয়ালের কোণ ঘেঁষে নয়, মুখোমুখি টেবিলের ধারটিতে।

টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি-একটা লিখছিল নীলাঞ্জন, মুখ তুলে চেয়ে বললে, 'কি চাই ?'

কি চাই ! এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে! দ্বিধায় দুলতে লাগল মেয়েটা।

'কোনো চাকরিবাকরি ?'

মেয়েটা কথা কয় না।

'কোনো সাহায্য-টাহায্য ? চাঁদা ? কোনো ফাংশানের টিকিট ?'

এত কথার উত্তর দিতে হ'লে বসতে হয়, বিস্তৃত হ'তে হয়। দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন ভালো দেখায় না।

কিন্তু যার কাছে এসেছি তিনি যদি বসতে না বলেন তো বসি কি ক'রে? বসতে বলবেন এমনও তো মনে হয় না। নিচু হ'য়ে আবার লেখায় মন দিয়েছে নীলাঞ্জন।

কিন্তু উদ্যোগ করতে দোষ নেই। উদ্যোগ ছাড়া কিছু হবারও নয়। মেয়েটা শব্দ ক'রে চেয়ার টানল। বসল নিজের থেকে।

তবু ওপক্ষে কিছুমাত্র উদ্যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। অনুমতি ছাড়া সশব্দে অমনি চেয়ার টেনে ব'সে পড়াটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা। যেমন জাঁদরেল রাগী লোক ব'লে নামডাক, নিশ্চয়ই রুখে উঠবে।

আসলে এই ঔদাসীন্য এই অনারম্ভও তো একরকমের রুক্ষতা। কিন্তু প্রতিপক্ষ একটু রুক্ষ না হ'লেও আনন্দ নেই। যে রূঢ় তার নম্রতা না জানি কত সুন্দর! যে কৃপণ তার না জানি অজস্রতা!

মেয়েটা অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমাকে নকুলবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কে নকুলবাবু?' প্রায় গর্জন ক'রে উঠল নীলাঞ্জন।

কে নকুলবাবু তাও বুঝিয়ে বলতে হবে? চারদিকে কোথাও একটা চাপরাসি-আর্দালি দেখা গেল না। এ কোথায় এসে উঠলাম!

'শহরে বত্রিশটা নকুলবাবু আছে। কে তোমার মুরুব্বি তা খুলে না বললে বুঝি কি ক'রে? আমি কি সর্বজ্ঞ?'

এত কষ্টেও একটু হাসল মেয়েটা। বললে, 'মোক্তার নকুলবাবু।'

'কেন, কোনো কেস-সংক্রান্ত বুঝি? তিনি গেলেন কোথায়?'

'আমাকে পৌঁছে দিয়েই চ'লে গেছেন।'

'এই ভরসন্ধেবেলায়? একা-একা?'

উলটো ক'রে বুঝল মেয়েটা। বললে, 'সঙ্গে গাড়ি আছে।'

'গাড়ি? এই মফস্বল শহরে মোক্তারের আবার গাড়ি কোথায়?'

'ঘোড়ার গাড়ি।'

'এখনো আছে নাকি এ শহরে? সাইকেল রিক্‌শার ঠেলায় উঠে যায় নি?'

'একখানা আছে।'

'তাতে ক'রে মক্কেল পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়ল?' নীলাঞ্জন মোটা চুরুট ধরাল: 'মক্কেলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে উকিল-মোক্তারই ঘরে ঢোকে শুনেছি। এ যে দেখি বিপরীত। মক্কেলকে পৌঁছে দিয়ে মোক্তারেরই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা। কি কেস? ম্যাট্রিমনিয়েল?' মুখের উপর স্পষ্ট চোখ ফেলল নীলাঞ্জন।

'এখনো হয় নি বিয়ে।' চোখ নামাল মেয়েটা।

মাথার দিকে তাকাল নীলাঞ্জন। মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথের মতো শাদা সিঁথি। বললে, 'তবে কি অন্য জাতীয় ?'

'তেমন কোনো কেস নয়—'

'কেস নয় মানে ? মোক্তার মানেই মকদ্দমা। মোক্তার মানেই জামিননামা। মকদ্দমা তো কোর্টে না গিয়ে এখানে কেন ?'

এখানে কেন ? তবে কি আমার কোনো ভুল হয়েছে ? ভুল বাড়িতে এসেছি ? আমি এলুম কোথায় ! আমাকে তো নিয়ে এল !

মুখ ম্লান ক'রে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা। বললে, 'আমার কি ভুল হয়েছে ?'

'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।' প্রায় হুমকে উঠল নীলাঞ্জন।

'এটা কি তবে হালদারসাহেবের কুঠি নয় ?'

'শহরে এ কে না জানে ?'

'আর আপনিই—'

'হ্যা, আমিই। মাতাল, লম্পট, দুশ্চরিত্র— শোন নি আমার সম্বন্ধে ?'

যেন সহজে নিশ্বাস ফেলল মেয়েটা। বললে, 'শুনেছি।'

'সেদিক দিয়ে কিছুই ভুল হয় নি। ভুল হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে ?' কেমন অস্থির হ'য়ে উঠল মেয়েটা। এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল।

'নিজের সম্বন্ধেই তোমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তোমাকে এখানে কেউ নিয়ে আসে নি, তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ।'

ও, এই কথা। একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসল মেয়েটা।

'তোমার উকিল-মোক্তার লাগবে কেন ? তুমি নিজেই তোমার জবানবন্দি, নিজেই তোমার সওয়াল-জবাব। কি, ঠিক নয় ?'

'ঠিক।'

'তুমি কিডন্যাপিঙের বয়সের মধ্যে আর পড় না। সে সীমা তুমি অনেকদিন ছাড়িয়ে এসেছ। তা ছাড়া, তুমি যদি নিজের থেকে এখানে না আস সাধ্যি কি তোমাকে কেউ জোর ক'রে নিয়ে আসে?'

'না, আমি নিজের ইচ্ছেতেই তো এসেছি।' চেয়ারের হাতলদুটো শক্ত ক'রে ধরল মেয়েটা।

'তবে বলছিলে কেন নকুলবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'কি ভাবে বললে বুঝতে পারবেন তারই জন্যে অমনি ক'রে বলা।' মেয়েটা মাথা নিচু করল: 'একটা পরিচয়পত্র—'

'বেশ, তবে যাও পাশের ঘরে।'

পাশের ঘর! যেন কত রাজ্যের পথ, কত দিগন্ত পেরিয়ে সে দূর। একটা পর্দার তো মোটে ব্যবধান। তবু মনে হ'ল অন্তরালে কি যেন আতঙ্ক রয়েছে ওত পেতে।

ভয়ের কিছু আছে ব'লে তো শোনে নি। সকলের থেকে আলাদা হ'য়ে একা-একা থাকে হালদার। স্ত্রীর থেকে আলাদা, ছেলের থেকে আলাদা। দুর্গম অরণ্যে ক্লান্ত, পরিত্যক্ত পর্বত। ভিতর থেকে ক্ষয় হ'তে-হ'তে কি মূর্তিতে বিদীর্ণ হয় ঠিক কি।

নিজের ইচ্ছেতেই যেতে হবে। পা বাড়াল মেয়েটা।

যাবে, শেষ পর্যন্ত যাবে। ভয়ও তো একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ।

'যাও, লুকোও, বেশিক্ষণ থাকতে হয় না আপিসঘরে।' তাড়া দিল নীলাঞ্জন।

এই বুঝি ড্রয়িংরুম। সব সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো। নম্রাভ আলো জ্বলছে স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও এতটুকু হাঁটাচলা

নেই, কথাবার্তা নেই। স্তব্ধতা যেন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে চারদিক থেকে।

লম্বা সেটির এক কোণে বসল মেয়েটা।

কিন্তু কতক্ষণ এমনি ব'সে থাকবে? সেও কি কার্পেট, কৌচ, এই সব আসবাবপত্রেরই একজন? তারও কি সুখদুঃখ নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, আশাআকাঙ্ক্ষা নেই?

আপিসঘরের দরজাটা বন্ধ হ'ল শব্দ ক'রে।

এক গাছ পাখি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, আকাশ কালো ক'রে ঝড় আসছে। পারের কাছে নদীর জল কুলকুল ক'রে উঠেছে, শাদা চাদর উড়িয়ে এল বুঝি অমাবস্যার কোটাল।

এবার আসবে নীলাঞ্জন।

'পরিচয়পত্র?' বলতে-বলতে ঘরে ঢুকল নীলাঞ্জন: 'ফাঁকা সন্ধ্যায় চুপচাপ একা ব'সে আছি, তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে, জিগ্‌গেস করলুম, কে, তুমি ব'লে উঠলে, আমি- এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?' ঘরে পা দিতেই যেন চমকে উঠল. 'এ কি, তুমি? এখনো ব'সে আছ?'

'ব'সে আছি।' নিরুপায়ের মতো শোনাল কথাটা।

'কার জন্যে ব'সে আছ?'

'আর কার জন্যে।' চোখ দুটি স্থির ক'রে গাঢ় ক'রে তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। বললে, 'আপনার জন্যে।'

কত বড়ো প্রকাণ্ড লোক। কত বড়ো পণ্ডিত। সমাজের কত উঁচু চুড়োয় এসে বসেছেন। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। কত টাকা। কত মান। কত শক্তি। আর, কি সুন্দরই বা দেখতে!

'আমার জন্যে কেউ ব'সে আছে এ ভাবতে ভারি সুখ হয়। সুখ জিনিসটাই ভাবনার মধ্যে, জিনিসের মধ্যে নয়। কিন্তু আমি ভারি

আশ্চর্য হচ্ছি,' নীলাঞ্জন এক পা এগোবার ভঙ্গি করল : 'কই, তুমি তো কাঁদছ না ?'

পাশে জায়গা ঢের আছে, তবু আরো একটু সংকুচিত হ'ল মেয়েটা। বললে, 'কাঁদব ? কাঁদব কেন ?'

'এর আগে যে এসেছিল সে এ ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর ছিটকে প'ড়ে কেঁদেছিল একচোট।'

'কেন ?'

'ভয়ে।'

'ভয় কিসের ? আসতেই যদি পারল তবে আবার কাকে ভয় ?'

'ভয়কে ভয়। তুমি যে নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ত আছ এইটেই আশ্চর্য।'

মুচকে হাসল মেয়েটা। বললে, 'আমি যে সব জেনেশুনে এসেছি।'

তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। মাথার চুল প্রায় শাদা, পাতলা হ'য়ে স'রে বসেছে দূরে-দূরে। কপাল তাই বেশি চওড়া ও চকচকে দেখাচ্ছে। সাফল্যে একটু স্থূল কিন্তু মুখে কেমন একটা আত্মনিমগ্ন শিশুর ভাব। মনে-মনে ভাবছিল মেয়েটা, সত্যিই কামনা কি করুণ !

'কি, কতদূর জেনেছ তুমি ?' হালকা হবার চেষ্টা করেছিল নীলাঞ্জন, কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর শোনাল।

'তা জানি না। কিন্তু, তারপর, তাকে, সেই আগের জনকে কি করলেন ?'

'তাড়িয়ে দিলুম।'

তারপর কতক্ষণ কোনো কথা নেই।

মেয়েটা ছোট্ট একটা হাই তুলল।

হঠাৎ নীলাঞ্জন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে।

তোমাকে একটা সাইকেল রিক্শা ডাকিয়ে দিই। রাত মন্দ হ'ল না। বাড়ি ফিরে যাবে তো ?'

এতটা যেন ভাবতে পারত না মেয়েটা। আহতের মতো উঠে দাঁড়াল। বললে, 'দরকার কি। একটু হেঁটে গিয়েই রাস্তায় পেয়ে যাব রিক্শা।'

'হ্যাঁ, নিজের জোরে চ'লে যাওয়াই ভালো। নিজের ইচ্ছেয় আসা, নিজের জোরে চ'লে যাওয়া।'

চ'লে গেল মেয়ে। যাবার আগে নীলাঞ্জন জিগ্‌গেস করলে, 'তোমার ফি-টা পেয়েছ ?'

'ফি, কিসের ফি ?' আঁচলে রাগের ঝলস দিয়ে উঠল রিক্শাতে।

'আরেকদিন এস।'

পরদিন সকালে নকুল এসে হাজির। হাড়গিলের মতো চেহারা, নাকের উপরে একটা আবার বড়ো আঁচিল। ধূর্ত যে সাপ তাকেও আমি জব্দ করি আমার নামেই তার পরিচয়।

'স্যার—'

স্টেনোকে ডিকটেশন দিচ্ছিল নীলাঞ্জন, নকুল ঘরে ঢুকল।

নথিপত্র গুটিয়ে নীলাঞ্জন তাকাল ঘড়ির দিকে। স্টেনোকে বললে, 'কোর্টে।'

নকুল বললে, 'দেবলাকে আপনার পছন্দ হ'ল না ?'

'কে দেবলা ?'

'কাল সন্ধ্যায় যে এসেছিল—'

'না, না, বেশ মেয়ে। তোমার সনাতনীদের চেয়ে ভালো। বেশ অন্যরকম।'

'ফোর্থ ইয়ারে পড়ে স্যার।'

'ফোর্থ ইয়ার !' নীলাঞ্জন মুগ্ধের মতো বললে, 'তাই, তাই অমন স্মার্ট। চালাক-চালাক। রাগটুকুও আছে ভাগটুকুও আছে। কার মেয়ে ?'

'ডিস্ট্রিক্ট বারে প্র্যাকটিস করে ঐ যে উকিল ভূপেন ঘোষাল, তার মেয়ে।'

'কে ভূপেন ঘোষাল ?'

'পাকিস্তান থেকে এসেছে, রিফিউজি উকিল—'

'তাই চেকনাই আছে খানিকটা—'

'কিন্তু তাকে নাকি আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন ?'

'তাড়িয়ে দিয়েছি ?'

'খুব দুঃখ করছিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়ে রেখেই নাকি চ'লে যেতে বলেছেন। খুব অপমানিত বোধ করেছে—'

হেসে উঠল নীলাঞ্জন : 'তার টাকাটা তাকে পুরোপুরি দিয়েছ তো ?'

'তা দিয়েছি।'

'তা হ'লে তার নালিশ কি ?'

'তবু আপনার মতো জেলার এমন একজন প্রধান পুরুষের কাছ থেকে সে একটু স্নেহ একটু দয়া আশা করছিল—একটু বন্ধুতা।'

'খাসা বলেছ। যাকে অপমান করতে পারতুম তাকে যে অপমান করলুম না সেইটেই তার অপমান ? বেশ, তাকে আরেকদিন আসতে বোলো।'

'আর কি আসবে ?' দর বাড়াচ্ছে নকুল।

'একদিন যখন এসেছিল তখন আরেকদিনই বা আসবে না কেন ? সেও টাকা এও টাকা। টাকা মানেই আরো-টাকা। রোজগার মানেই আরো-রোজগার।'

'হ্যাঁ, আরো টাকা।' নাকের ডগার আঁচিলটা সূক্ষ্ম ক'রে একটু চুলকে নিল নকুল। বললে, 'আমিও ধৈর্য ধরতে বলেছি দেবলাকে। বলেছি হাড় থাকলেই মাস হবে।'

আর কি সে আসবে!

প্রতীক্ষা ক'রে থাকার আনন্দ আর নেই জীবনে। ক্যালেণ্ডারে মাসের প্রথম তারিখটির জন্যে যা কিছু প্রতীক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু প্রতীক্ষায় আনন্দ কোথায়? এ যে নতুন রকম যন্ত্রণা।

এ যে শুধু প্রতীক্ষার জন্যেই প্রতীক্ষা ক'রে থাকা।

গাঢ় সন্ধ্যায় একটা সাইকেল রিক্‌শা এসে দাঁড়াল।

'নিজের থেকেই এসেছি।' আপিসরুমে না ঢুকে ড্রয়িংরুমে ঢুকল দেবলা।

'আর তোমার জন্যেই তো ব'সে আছি আমি।'

তাকাল নীলাঞ্জন। পাতলা, একহারা চেহারা, দুর্বল, যেন অনেক শ্রান্তক্লান্ত। তারই মধ্যে একটু ঘষামাজা সেরে নিয়েছে। চুল বিনুনি ক'রে বাঁধা, পায়ে স্যাণ্ডেল। হাতে সরু ক'গাছি কাঁচের চুড়ি।

মুখোমুখি বসল কৌচে। নীলাঞ্জন চুরুট ধরিয়ে বললে, 'কথা বলো—'

'কথা?'

'শুধু কথা। কথাই তো সব। রাতদিন শুধু আপিস-আদালতেরই কথা কইছি, বিষয়-বাণিজ্যের কথা। ভালোবাসার কথা কতদিন শুনি নি, বলতেও ভুলে গেছি। হোক মিথ্যে কথা, তবু বলতে সুন্দর শুনতে সুন্দর। মিথ্যেকথাগুলিই তো জীবনকে রঙিন ক'রে রেখেছে।'

'সত্যকথাও তো আছে কিছু।'

'আছে নাকি? কি সত্য?'

'দারিদ্র্য। দুঃখ। সংগ্রাম।'

অদ্ভুত শোনাল দেবলাকে, প্রায় অশরীরী। উৎসুক হ'য়ে জিগ্‌গেস করল নীলাঞ্জন, 'তুমি কে?'

'আমি আবার কে। আমি এক রিফিউজি।'

'রিফিউজি? আর কোনো পরিচয় নেই?'

'না। একটা নতুন জাত তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। তার নাম রিফিউজি। আর কোনো পরিচয় নেই। আমি তাদেরই একজন।'

'তুমি কি ক্যাম্পে থাকো?'

'থাকবার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই হয়েছে কোনোরকমে। একেবারে কাপড়ের তাঁবু নয়, তবু বৃষ্টির দিনে জল পড়ে ছাদ ফুঁড়ে। দুর্দান্ত ভাড়া। ছাগলভেড়াতেও থাকে না যেমন আছি আমরা—' গলা প্রায় ভারি হ'য়ে এল দেবলার।

'তোমার কে আছে?'

'আমার আবার কে থাকবে! আমার শুধু আপনি আছেন।' চোখের পাতা নাচিয়ে খুশির ঝিলিক দিল দেবলা।

'সে তো এ মুহূর্তে তুমিও আমার আছ। এ মুহূর্তটির কথা নয়। জীবনে তোমার কে আছে?'

'বাবা-মা আছেন, ছোটো-ছোটো অনেকগুলি ভাইবোন আছে।'

'তোমার বাবা?'

'ভূপেন ঘোষাল। পাকিস্তানে ওকালতি করতেন। এখানে কি ক'রে কি করতে পারবেন বলুন। কিছুই পারছেন না। সব আমার উপর ভার। আমিই বড়ো। কিন্তু আমার সাধ্যি কি কিছু করতে পারি?'

'কলেজে পড় না?'

'না প'ড়ে উপায় কি। পরিবার প্রতিপালনের পথ তো একটা দেখতে হবে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করবারও যেন সময় নেই।' হাতে কাচা শাড়ির আঁচলের ধারটায় অন্যমনস্কের মতো হাত বুলুতে লাগল দেবলা : 'পথ একটা এখুনি পাওয়া দরকার। নইলে কি আর আসি ?'

'খুব অভাব ? নয় ?'

'শুধু একলা আমার তো নয়, সমস্ত ভাইবোনগুলির। অসুখবিসুখ তো লেগেই আছে, ওষুধ কিনব কোত্থেকে! জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, সেলাই করবারও আর জায়গা নেই।' ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল দেবলা : 'কিন্তু কেবল যদি অভাবের কথাই বলি, ভাবের কথা, ভালোবাসার কথা আসবে কি ক'রে ?'

'তুমি ভালোবাসায় বিশ্বাস কর ?' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল নীলাঞ্জন।

'শুনেছি বটে দেখি নি।'

'যে ভালোবাসার বয়স নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই ? যে ভালোবাসা কিছু চায় না কেবল দেয়। তুমি ও কোত্থেকে দেখবে ? তোমার কতটুকুই বা বয়স, অভিজ্ঞতাই বা কি! কিন্তু দেখবে একদিন। সে দেখার জন্যে বেঁচে থেকে সুখ আছে—'

'তত সময় কই ?'

'যে ভালোবাসা বিচার করে না, অভিসন্ধি করে না—'

'এদিকে দরজায় যে নেকড়ে বাঘ ব'সে আছে।' হাসল দেবলা : 'নকুলবাবু বলেন হাড় থাকলেই মাস হবে। কিন্তু হাড় ক'খানা টিকলেই তো মাংসের আশা। টিকিয়ে রাখি কি ক'রে ?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নীলাঞ্জন। বললে, 'কিছু খাবে ?'

'খাব ?' এতটা যেন ভাবতে পারত না দেবলা : 'কি খাব ?'

'আমি যা খাই। ডাল-ভাত, মাছ-দুধ। খাবে? মনে হয় কত দিন তুমি যেন পেট ভ'রে খাও না।'

'না, না, সে কি কথা!' কি ইঙ্গিত পেল কে জানে, দেবলাও উঠে পড়ল। বললে, 'আপনার খাবার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আমি তবে উঠি।'

নিস্পৃহের মতো নীলাঞ্জন বললে, 'আবার এস।'

দরজার কাছে এসে দেবলা একটু থামল। নড়ল-চড়ল, আবার থামল। বললে, 'যাই তা হ'লে?'

'এস। যাওয়াটাই বড়ো কথা নয় আসাটাই বড়ো কথা। আর শোনো—'

এখনো বারান্দাটা পেরোয় নি পুরোপুরি, দাঁড়াল দেবলা।

নীলাঞ্জন বললে, 'তোমার ঠিকানাটা আমাকে দেবে?'

'ছি ছি, আমার আবার ঠিকানা! সেখানে আপনি যেতে পারবেন নাকি? আপনাকে তো বসতেই জায়গা দিতে পারব না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।'

'আচ্ছা, তোমার টাকাটা ঠিক পাচ্ছ তো?'

আহা, কি ভালোবাসার কথা! কানের মধ্যে যেন ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল। পড়ি-মরি ক'রে বেরিয়ে গেল দেবলা।

সেদিন আকাশ উপুড়-করা বৃষ্টি, তারই মধ্যে চ'লে এসেছে মেয়েটা।

'এ কি, ভিজে গেছ নিশ্চয়ই। কি হবে!' চঞ্চল হ'ল নীলাঞ্জন।

'বেশি নয়—এ শুকিয়ে যাবে এখুনি।'

'না, না. ভীষণ—ভীষণ অসুখ করবে। বদলে ফেল, শাড়িটা বদলে ফেল শিগগির—'

'বেশ বলেছেন! এ বাড়িতে শাড়ি পাব কোথায়?' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল দেবলা।

'আছে শাড়ি। তোমার জন্যে কিনেছি একখানা।'

'আমার জন্যে ?'

'যাও, সোজা ওপরে চ'লে যাও। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে বেডরুম। বেডরুমে খাটের ওপরে দেখবে তোমার শাড়ি।'

'উপরে যাব ?'

'যাও না। সোজা। ঐ তো সামনে সিঁড়ি--'

'আপনি ?'

'আমিও যাচ্ছি এখুনি।' একটা ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল নীলাঞ্জন, মুখ তুলে বললে, 'কেমন মানাল তোমাকে শাড়িটাতে, দেখব না ?'

সিঁড়িতে আলো জ্বলছে, এক-পা এক-পা ক'রে উঠতে লাগল দেবলা। এই বোধহয় স্বর্গের সিঁড়ি। উঠছে তো উঠছেই, চলেছে সে কোন ঊর্ধ্বলোকে, কোন বসনান্তরে ? বাড়িঘর নির্জন তবু এত ভয় কেন ? কে যেন দেখে ফেলবে ! ধ'রে ফেলবে !

এই শোবার ঘর ! কত দূর চ'লে এসেছে আজ দেবলা। রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হ'ল !

বা, এই শাড়ি ! এই জামা !

দরজার পর্দার ধার দুটো আরো একটু-একটু ক'রে টেনে দিয়ে প্রান্তের ফাঁকটুকু ভ'রে দিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কোথায় সুইচ। তারপরে ঘর অন্ধকার ক'রে দিল।

এর মধ্যেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ না হ'লে বাঁচি।

যখন জুতোর শব্দ হ'ল তখন ফের আলো জ্বলেছে। ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ ঘুরন্ত পাখার নিচে মেলে দেওয়া হয়েছে, আর নতুন শাড়ি-জামায় খাটের উপর পাতা বিছানায় গা ঢেলে শুয়ে আছে দেবলা।

'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' আবদেরে শিশুর মতো বললে দেবলা, 'এমন সুন্দর বিছানায় জীবনে ঘুমুই নি কোনোদিন।'

'কিন্তু একা-একা পারবে তো ঘুমুতে?'

'আপনার নিচে বুঝি অনেক কাজ?' দেবলার গলা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে।

'অফুরন্ত। তুমি দেখবে চলো—'

'সত্যি, এই প্রকাণ্ড ঘরে আমি ঘুমুব, আমাকে কে পাহারা দেবে? তারপর বৃষ্টি হ'য়ে যাবার পর চারদিকে কেমন সব ফিসফিস শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ভূতের বাড়ি। তাই না?' তবু আরো খানিকক্ষণ শুয়ে রইল দেবলা।

দূরে-দূরে ঘুরঘুর করছে নীলাঞ্জন। একটা বুঝি সিগারেট ধরাল।

দেবলা উঠে পড়ল ঝাপটা দিয়ে। পাখার নিচে মেলা শাড়িব্লাউজ দুটো হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগল: 'শুকিয়েছে— কি বলেন?'

'সে কি, যা প'রে আছ তাইতেই চ'লে যাও।'

'সর্বনাশ! লোকের কাছে আমি কি জবাবদিহি দেব? আমার ছেঁড়াখোঁড়া জলকাদামাখা জীর্ণ শাড়িই ভালো।'

সুইচটা অফ ক'রে দিল দেবলা।

নীলাঞ্জন কি বেরিয়ে গেল বাইরে?

আলোজ্বলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নীলাঞ্জন বললে, 'আবার এস।'

দেবলার মুখে কথাটি নেই।

নীলাঞ্জন তার হাত ধরল। বললে, 'তুমি বড্ড অস্থির—'

'তা ছাড়া আবার কি।' প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে দেবলা, 'দিন যে ফুরিয়ে যাচ্ছে—'

'তাই ব'লে তুমি ফুরোবে কেন ?'

ক'দিন পরে ক'জন উকিল এসে হাজির।

'আসুন, আসুন—'

'পার্টিশানের পর ইনি এখানে প্র্যাকটিস করছেন, নাম ভূপেন ঘোষাল।'

'ভূপেন ঘোষাল! বা, বিলক্ষণ চিনি।' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল নীলাঞ্জন : 'কেন, কি ব্যাপার ?'

'আপনার আশীর্বাদে ব্যাপার শুভ।' করজোড়ে বললে ভূপেন ঘোষাল, 'আসছে শনিবার আমার মেয়ের বিয়ে। যাবেন আপনি।'

আরেকজন ফোড়ন দিল : 'যেতেই হবে আপনাকে।'

'আপনার মেয়ে ? কোন মেয়ে ?' অগাধ শূন্য যেন হাতড়াতে লাগল নীলাঞ্জন।

'আমার ঐ একটিই মেয়ে।'

'নামটি কি ?'

'দেবলা।'

চিঠি দিল। পড়তে চেষ্টা করল নীলাঞ্জন, ঝাপসা-ঝাপসা ঠেকল। ছেলে কি করে, কেমন দেখতে কিছুই জিগ্‌গেস করার কথা মনে এল না। শহরের সেই যে একখানামাত্র ঘোড়ার গাড়ি আছে তাতে ক'রে চ'লে গেল উকিলের দল, সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

আর আসবে না কোনোদিন।

তবু এই যেন অগাধ শান্তি অতলান্ত শান্তি, আর আসবে না।

আহাহা, বেঁচে গিয়েছে। গুলির নাগালের মধ্যে এসে পড়েছিল পাখি, উড়ে পালিয়েছে। মোটরের চাকার তলায় পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছে বাছুর।

তবু, আর আসবে না!

মামুলি নেমন্তন্ন, কে যায়! কেবা সোনার একটা দামি হাতঘড়ি কেনে।

নীলাঞ্জন আসবে এ কেউ প্রত্যাশা করে নি। সবাই যেন হাতে চাঁদ পেল। সবাই নীলাঞ্জনকে নিয়ে ব্যস্ত।

নীলাঞ্জন বললে, 'কনে দেখব।'

কনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল নীলাঞ্জনকে। সসজ্জা কন্যা নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

এ কি! এ কে! এ কাকে দেখছি? এ তো সে নয়। এ যে আলাদা, অন্যরকম। এ তো অনেক হৃষ্টপুষ্ট নধর নিটোল। রংও তো ঢের পরিষ্কার।

'নকুল! নকুল!' কাকে যেন ডেকে উঠল নীলাঞ্জন।

'কাউকে ডাকছেন স্যার?'

'দূরে নকুল ভটচাজকে দেখলাম না?' নীলাঞ্জন আমতা-আমতা করতে লাগল।

'মোক্তার নকুল ভটচাজ? সে এখানে কোথায়?'

'সত্যিই তো, উকিলের বাড়ি বিয়েতে মোক্তার আসবে কেন?'

'তার জন্যে নয় স্যার। সই জাল ক'রে উদ্বাস্তুদের টাকা তুলে নিয়েছে নকুল। পুলিশ চার্জসিট দিয়েছে। ধরতে পারছে না। হুলিয়া বেরিয়েছে। ক্রোক হ'য়ে গিয়েছে বাড়িঘর।'

তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছ কি!

ঠিকানাটা মনে আছে না? একবার সেখানটা ঘুরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু যদি সেখানে না থাকে? কোথাও না থাকে?

বা, এই সামনেই তো আছে। মূর্তিমতী অব্যাহতি। মূর্তিমতী পবিত্রতা।

কনের অচেনা বাঁ হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল নীলাঞ্জন। নিজের হাতে ঘড়িটি পরিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'ঘড়ি কি বলছে জানো ?'

যেন জানে, মেয়েটি তেমনি ক'রে হাসল।

'বলছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু নিজেকে ফুরিয়ে ফেলো না।'

জন্মান্ধ

হাসি ! হাসি !

কলতলায় চায়ের বাসন ধুতে-ধুতে মনে-মনে হাসল একটু মহুয়া।

পাশের বাড়ির মেয়েটিরও নাম হাসি না ? কেউ বুঝি দেখা করতে এসেছে বাইরে থেকে। ডাকে কেমন একটু ব্যস্ততার রং না ? ব্যস্ততার আড়ালে কেমন যেন একটু গাঢ়তারও আভাস আছে। মনে-মনে আবার হাসল মহুয়া।

মেয়েটা কি কানে শুনতে পায় না নাকি ?

আর, হন্তদন্ত হ'য়ে অমন ডাকবারই বা কি দরকার। কড়া নাড়লেই তো হয়। যা বলবার যাকে বলবার তখনই তো তা বলা যায় স্পষ্ট ক'রে। চেঁচানোর মানে কি ?

ঠুং, ঠুং, কড়া ন'ড়ে উঠল। বিদ্রূপে যেমন ক'রে মুখ টিপে হাসে তেমনি ক'রে মহুয়া হাসল আবার মনে-মনে। কিন্তু কড়া নেড়েও যেন লোকটার শান্তি নেই। আবার সঙ্গে-সঙ্গে চাপা গলার আওয়াজ : হাসি ! হাসি !

সত্যি, পাশের বাড়ির কড়ার আওয়াজ কি ঠুং ঠুং ?

'বউমা, বাইরে কে ডাকছে তোমাকে। শুনতে পাচ্ছ না ?' উপর থেকে ডেকে উঠলেন স্বর্ণময়ী।

আমাকে ডাকছে ? ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল মহুয়া।

নববধূর পক্ষে যেটুকু সমীচীন যেন তারও চেয়ে বেশি কঠিনসংবৃত হ'ল। এগিয়ে গেল চোরের মতো। আমাকে আবার কে ডাকে।

'এ কি! তুমি?' মহুয়ার মনে হ'ল মুখের মধ্য থেকে জিভটা হঠাৎ উড়ে গেছে।

'একটা ইণ্টারভিয়ুতে এসেছি। চাকরির ইণ্টারভিয়ু।'

'এতদূরে?'

'এ আর কতটুকু! মানুষ আরো কত দূরে যায়।'

'উঠেছ কোথায়?'

'কোথায় আর উঠব? এখানে।' উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই ভিতরের উঠোনে ঢুকে পড়ল অমলেশ।

ভয়ে-ভয়ে উপরের দিকে তাকাল মহুয়া। দোতলার বারান্দা ফাঁকা।

একটু সাহস দেখাবার চেষ্টা করল। এমনভাবে একটু স'রে দাঁড়াল যেন অমলেশ বাধা পায়। বললে, 'এখানে উঠবে কোথায়? এখানে তোমাকে কে চেনে?'

'তুমি চেন।'

স্বর্ণময়ী নিচেই নেমে এসেছেন। ভিতরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস করলেন, 'এ কে বউমা?'

'সম্পর্কে আমার মাসতুতো দাদা। এখানে এক চাকরিতে ইণ্টার-ভিয়ুতে এসেছে।'

'বেশ তো, ভিতরে নিয়ে এস। এ অঞ্চলে কত কাল আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখি নি—'

বুকটা হালকা হ'য়ে গেল। মহুয়া বললে, 'এখানেই উঠেছে।'

'বা, এখানেই তো উঠবে। আপনজন থাকতে যাবে কোথায়?'

'কাল রাত্রের ট্রেনে এসেছি।' ভিতরে আসতে-আসতে অমলেশ বললে, 'কোথায় কোন মহল্লায় বাড়ি, অনেক খুঁজতে হবে তাই রাত্রে

আর বেরোই নি। সারারাত স্টেশনেই ছিলাম। সকালে যে বেরিয়েছি বাক্স বিছানা স্টেশনেই প'ড়ে আছে। কি জানি যদি না পাই ঠিকানা। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তায় সারারাত্রির অনিদ্রা—'

সত্যিই তো, আহা, তেমনিই তো মনে হচ্ছে। স্নেহচক্ষু দিয়ে একবার তাকালেন স্বর্ণময়ী। কেমন হাক্লান্ত ভেঙে-পড়া চেহারা। শুধু এক রাত্রি নয় যেন কত রাত্রি ঘুমোয় নি। স্নান করে নি। খায় নি পেট ভ'রে।

'ওপরে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। খাটে বিছানা পেতে দাও। বাথরুমে জল আছে কিনা দেখ।' আতিথেয়তায় প্রশস্ত হলেন স্বর্ণময়ী।

কে কাকে নিয়ে এল, টেনে না ঠেলে, কেউ জানে না।

দোতলার এক পাশে লম্বাটে একটা ঘর। সদ্য বিয়ের নতুন আসবাব দিয়ে ঠাসা। সে সব মুখস্থকরা মামুলি সাজপাট। নতুন পালিশের গন্ধ মাখা।

একবার চারদিক তাকাল অমলেশ। বললে, 'তোমার স্বামী কোথায় ?'

'কলকাতায়।'

'সেখানেই থাকে বুঝি ?'

'চাকরি করে।'

'তুমি ?'

'আমি পরে যাব।' মহুয়া চোখ নামিয়ে বললে।

'না, না, পরে নয়, একসঙ্গেই যেতে হবে।' কেমন অদ্ভুত ক'রে হেসে উঠল অমলেশ : 'একসঙ্গেই যাবার কথা।'

একবারটি বসতেও বলল না মহুয়া, যেন এখুনি চ'লে যাবে এমনি

আশা করছে। অমলেশ একটু পায়চারি ক'রে দেয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগল। শুধু ছবি? দেখতে লাগল দেয়ালে আর কি লেখা আছে!

'তোমার ইণ্টারভিয়ু কবে?' মনের পাশ দিয়ে কথা একটা উড়ে যাচ্ছিল, মহুয়া লুফে নিলে।

'আজ।'

'আজ? আজ তো ছুটি।'

'ছুটি! তাই নাকি?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসল অমলেশ: 'কে জানে আমার হয়তো বা ছুটির ইণ্টারভিয়ু।'

'ইণ্টারভিয়ু কোথায়?'

'কোথায় আবার! এই বাড়িতে।'

'এই বাড়িতে?'

'এই ঘরে।'

'কার সঙ্গে?'

'জানো না কার সঙ্গে?' একটু যেন রুষে উঠল অমলেশ।

যেন সমস্তটাই একটা রসিকতা আর সেটা বেশ বুঝতে পেরেছে এমনি ভাব ক'রে চিবুকে টোল ফেলে মহুয়া হেসে উঠল। বললে, 'কিন্তু ইণ্টারভিয়ুর আগে একটু সাজগোজ করবে না? কোনো জিনিসই সঙ্গে নিয়ে আসো নি, সামান্য একটা অ্যাটাচি কেসও নয়? শেভ করবে কি ক'রে? স্নান ক'রে পরবে কি? পরের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াবে?'

'একটা, একটা শুধু জিনিস এনেছি।' পকেট হাতড়ে একটা পুরিয়া বের করল অমলেশ: 'এই নাও। নেবে?'

কোনো হীরে-পান্নার কণা হয়তো, অন্যমনে মহুয়া হাত বাড়াল। জিগ্গেস করল, 'কি?'

'বিষ।'

তক্ষুনি হাত গুটিয়ে নিল মহুয়া। একটা আর্তনাদ গলার কাছে এসে আটকে রইল। মনে হ'ল হৃৎপিণ্ডটা যেন কে মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে।

হাত ধরবার জন্যে হাত বাড়াল অমলেশ। সাধ্য কি আর পায় নাগালের মধ্যে। মহুয়া কখন স'রে গিয়েছে দরজার কাছে।

কিন্তু অমলেশও তো আজ মারমুখো। ছুটে দরজার কাছে গিয়ে মহুয়ার পথ আটকাল। পর্দাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললে, 'কার সঙ্গে ইণ্টারভিয়ু জিগ্‌গেস করছিলে না? এবার বলি, মৃত্যুর সঙ্গে, পরমতম ছুটির সঙ্গে। কি, মনে নেই?'

চোখে-মুখে রাগের ঝলস আনবার চেষ্টা ক'রে মহুয়া বললে, 'কি মনে থাকবে?'

'জানি থাকবে না। তাই তোমার চিঠিটা পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছি। যেটায় লিখেছ, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, আর কোথাও বিয়ে হ'লে আত্মহত্যা করবে।'

কি ভয়ানক বিশ্রী লাগছে শুনতে— মহুয়া মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'ও আমি লিখি নি।'

'লেখ নি? এই দেখ সেই চিঠি।' সত্যি-সত্যি বুক-পকেট থেকে চিঠিটা বের করল অমলেশ। খাম খুলে চিঠি বের ক'রে পড়ল জায়গাটা।

মহুয়ার ইচ্ছে হ'ল ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু অমলেশও হুঁশিয়ার।

'লিখেছি তো লিখেছি। অমন অনেক কথাই লেখা হয় চিঠিতে। সব কথা ফলে না।'

'তা তো তোমার এই টাটকা সুখের পালিশ-করা আসবাব দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। নতুন শাড়ি নতুন গয়না নতুন বিছানা নতুন সিঁদুর—'

'এই তো জীবন।'

'এই তো জীবন নয়। জীবন অন্য রকমও ছিল। কথা তা নয়। কথা হচ্ছে তুমি যে কথা দিয়েছিলে তা তুমি রাখবে কি না।'

'আমি আবার কি কথা দিয়েছিলাম!'

'এই যে পড়লাম। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, যদি আর কোথাও বিয়ে হয়—'

'আর তুমি?' চোখের পাতা দুটি একটু কাঁপল বুঝি মহুয়ার।

'আমি তো মরবই। আমি-তুমি দু-জনে মরব। এক ঘরে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে। তারই জন্যে খুঁজতে-খুঁজতে এসেছি তোমার শ্বশুরবাড়ি। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে। পকেটে বিষ নিয়ে।'

'তা তুমি মর। আমি মরব কেন?'

নিচে থেকে স্বর্ণময়ী ডেকে উঠলেন: 'তোমার দাদার জন্যে চা নিয়ে যাও বউমা।'

আশ্চর্য, দরজা ছেড়ে দিল অমলেশ। চ'লে যেতে-যেতে চার-পাশের দেয়াল-দরজা-জানলাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, 'পাশেই বাথ-রুম আছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। স্নান করতে চাও তো স্নান করো। আমি চা নিয়ে আসি।'

প্রায় পালিয়ে গেল মহুয়া। নিচে গিয়ে ভাবতে বসল।

'ডিম আর টোস্ট ক'রে দাও।' শাশুড়ি বললেন।

'টোস্ট নয়, ক'খানা লুচি ভেজে দিই। বেলা বেশি হয় নি। ভাত খেতে এখনো ঢের দেরি। হরবন্সকে বলুন কিছু মিষ্টি নিয়ে আসুক।'

মহুয়া কিছু সময় চায়। ভেবে নিতে সময় চায়। শুধু উপস্থিত-বুদ্ধিতে যেন কুলোচ্ছে না। একটু গভীর ক'রে চিন্তা করা দরকার। কি ক'রে দশ দিক থেকেই ত্রাণ পাওয়া যায়। কি ক'রে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে!

যা হঠকারী ছেলে, চরম কিছু একটা ক'রে ফেলতে পারে। পকেটে কাগজের পুরিয়ায় বিষ থাকা বিচিত্র কি। টুথ-পাউডার বা শাদা নুন নিয়ে এসেছে এমন মনে হয় না। শুধু ফাঁকা ভয় দেখাবার জন্যে এত পথ এসেছে পাগলের মতো এও যেন ধারণার বাইরে। নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটাবে।

এখন কি করা! শাশুড়িকে বলবে? শ্বশুরমশায়কে বলবে? পুলিশে খবর দেওয়াবে? আত্মহত্যার জন্যে তৈরি হওয়াও তো অপরাধ। খবর পেলে নিশ্চয়ই পুলিশ থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে। তা হ'লে একটা লোকের প্রাণ বাঁচে। শ্বশুরবাড়ির মান বাঁচে।

কিন্তু মহুয়ার? মহুয়ার নিজের মান বাঁচে না, লজ্জা বাঁচে না। ভিত স'রে যায়। বনেদ ট'লে যায়। তবে উপায়?

উপায় কোনো রকমে নিরস্ত করা। বিদেয় ক'রে দেওয়া। কোনো ছুতোয় বাড়ির বাইরে ঠেলে পাঠানো।

সত্যি, যদি মরবিই, কলকাতায় মরলেই তো হ'ত। গড়ের মাঠ ছিল, লেক ছিল, হাওড়ার পোল ছিল, তেরোতলা দালান ছিল। পকেটে বিষের পুরিয়া নিয়ে এতদূর কে আসে!

বিষের পুরিয়া না হাতি!

'তাড়াতাড়ি লুচি ক'খানা ভেজে ফেল বউমা।' স্বর্ণময়ী তাড়া দিলেন: 'কেমন একটা উপোসী-উপোসী চেহারা। সারা রাস্তা ট্রেনে-স্টেশনে কিছু খেতে পায় নি বোধ হয়।'

'এই হ'য়ে গেল মা।' চারদিককার ভয়ের মধ্যে শাশুড়ির এই আতিথেয় ভাবটিই যা একটু শান্তি। নইলে গোড়াগুড়ি থেকেই তিনি যদি সন্দেহচক্ষু ফেলতেন সে আবার একটা নতুন যন্ত্রণা হ'ত।

সানুষঙ্গ লুচির থালা নিয়ে উপরে এল মহুয়া। এল ত্বরান্বিত লঘিমায়। নিজের সংসারে প্রচ্ছন্ন একটু প্রভুত্ব দেখাবার দীপ্তিতে।

কিন্তু থালা নামিয়ে রাখতে যাবে, চোখের সামনে অমলেশকে দেখল না বিভীষিকা দেখল!

'তোমার জন্যে চা এনেছি।'

মুখ তুলে তাকাল অমলেশ। বললে, 'তুমি খাও।'

'আমি খাব?' হাসল মহুয়া।

'অন্তত একখানা লুচি খাও—'

কি আশ্চর্য অনুরোধ। আবার হাসল। 'একখানা খেলে বাকি সব তুমি খাবে?'

'সব না হোক কিছু অন্তত তো খেতে হবেই।'

একটা লুচি মুখে তোলবার জন্যে গোল করতে লাগল মহুয়া।

'দাঁড়াও। একটুখানি দিয়ে দিই, একরতি।' পকেটে হাত ঢোকাল অমলেশ: 'এ কি, আমার সেই প্যাকেটটা গেল কোথায়? তোমাকে তখন যেটা দেখালাম। তুমি নিয়ে গিয়েছ?'

চকচকে চোখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল মহুয়া।

'এই যে। এই খাটের উপরেই প'ড়ে আছে। রুমালটা তখন তুলতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বোধ হয়। কি ভীষণ!' অমলেশ প্যাকেটটা ফের পকেটে পুরল।

ছি ছি ছি! প্যাকেটটা হাতের কাছেই ছিল পরিত্যক্তের মতো, এক-পলক চোখের কাছে। ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিতে পারত অনায়াসে।

চিঠি সরাবার কথা ভাবছে, সবচেয়ে জরুরি ছিল প্যাকেটটা সরানো। সে সুযোগ পেয়েও সে হারাল। ছি ছি ছি।

'সামান্য একটুকুতেই কাজ হবে।' উঠে দাঁড়াল অমলেশ : 'দাঁড়াও তার আগে দরজাটা বন্ধ করি।'

'না, না, দরজা বন্ধ করতে পাবে না।' যেন তিরস্কার ক'রে উঠল মহুয়া। হাতের লুচিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর, দুর্জন সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার এমনি ভাবের থেকেই বললে, 'আমি চ'লে যাই।'

'চ'লে গেলে হবে কি ক'রে? তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। মরতে হবে।'

'আমি মরবার জন্যে বিয়ে করি নি।'

'তা জানি। স্বার্থপরের মতো সুখী হবার জন্যে করেছ। দুনিয়ায় সবাই স্বার্থপর। আমারও তবে তাই হ'তে দোষ কি। বেশ, আমি তবে একলাই মরি।' খাটের উপর ফের গিয়ে বসল অমলেশ : 'শেষে যেন একথা বোলো না আমি তোমাকে সুযোগ ক'রে দিই নি। কথা রাখি নি। প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিই নি। তোমাকে একলা ফেলে চ'লে গেলাম।'

দরজার কাছে মূর্তিমতী দ্বিধার মতো দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া।

'দরজা থেকে স'রে দাঁড়াও। হয় এপার নয় ওপার।' বললে অমলেশ, 'তুমি চ'লে গেলে আমাকেই দরজাটা বন্ধ করতে হবে। যেন কেউ তক্ষুনি-তক্ষুনি বিরক্ত না করে, নিশ্চিন্তে দু-দণ্ড ঘুমিয়ে নিতে পারি।'

'কিন্তু কেন, কেন তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে তুমি প্রাণ দেবে?' ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এল মহুয়া।

'তুমি তো শুধু নিজেকে তুচ্ছ করো নি, আমাকেও তুচ্ছ করেছ। নিজের মুখ নিজে আর আমি দেখতে পারি না।'

'আরো কত তুমি মেয়ে পাবে।'

'কে জানে পাব কিনা। পেলে মেয়েই পাব তোমাকে পাব না।'

'তোমার কিই বা বয়স। এই মোটে ফিফথ ইয়ার এম-এসসি। কত বৃহৎ জীবন কত মহৎ সম্ভাবনা—'

'যেমন তোমার। এ সব কথা ব'লে লাভ নেই। ভালোবাসাকে বঞ্চিত করতে পারো কিন্তু সত্যকে পারো না। যদি সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যা বলছি শোনো। দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও। তারপর আমার পাশে এসে শোও। চক্ষের পলকে সব শেষ হ'য়ে যাবে, স'রে যাবে যবনিকা। একটা আরেকরকম আশ্চর্য দেশে গিয়ে হাজির হব। তারপর আমাদের এখানে শেষ হ'য়ে যাবার পর আর সব কিভাবে শেষ হয় তা নিয়ে আমাদের আর চিন্তা নেই ভয় নেই লজ্জা নেই। এস, শোও—'

ঘৃণায় সমস্ত শরীর ছি ছি ক'রে উঠল মহুয়ার। লুচির থালাটা হাতে ক'রে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'যে আত্মহত্যা করে সে কাপুরুষ।'

'আর যে অন্যকে খুন করে?'

উত্তর দিল না মহুয়া। পাশের জানলা দিয়ে সব চা লুচি তরকারি একে-একে মেপে-মেপে ফেলে দিল বাইরে। ভরা থালা শাশুড়ির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

'বলি নি, ভীষণ খিদে পেয়েছে বেচারির। কি করছে?' জিগ্গেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'শুয়ে বিশ্রাম করছে।'

কতক্ষণ পরে ছোটো দেওর নীলুকে পাঠাল উপরে। দেখে এস তো ভদ্রলোক কি করছেন ! দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

ফিরে এল নীলু। বললে, বাথরুমে স্নানের জল পাঠিয়ে দিতে বললেন।

বুকের থেকে গুরুভার পাথর নেমে গেল। হরবন্সকে পাঠিয়ে দিল জল দিয়ে। যখন স্নান করবে তখন নিশ্চয়ই চারটি খাবে। আর ভাত চারটি পেটে গেলে ঘুম কোন না নেমে আসবে। আর এই লম্বা ট্রেন-ছোটার পর ঘুমও নিশ্চয়ই ছোটোখাটো হবে না। আর গা ঢালা ঘুমের পর থাকবে কি এই পাগলামি ?

সমস্তটাই একটা ছলনা কিনা পরিহাস কিনা তার ঠিক কি। একটা রঙিন নাটুকেপনা।

ডাক পিওন চিঠি দিয়ে গেল। সোমনাথের চিঠি।

প্রসন্নবদান্য চিঠি। উৎসবের বর্ণিল ভাষায় স্বপ্নময়। আদরে সোহাগে আবেগে আবেশে প্রভূতদক্ষিণ। এমন একটা চিঠি পাবার আজ যেন ভারি দরকার ছিল। যেন কত নির্ভর কত অভয় কত শান্তি এমনি ক'রে অনুভব করবার জন্যে চিঠিটা রেখে দিল বুকের মধ্যে।

নীলু এসে বললে, ভদ্রলোক স্নান করছে।

মুখ টিপে হাসল মহুয়া। স্নান করলে মাথাটা যদি একটু ঠাণ্ডা হয়। তারপর পেটে খানিকটা ভাত। তারপরে একটু ঘুম। তারপরে একটি নিটোল পলায়ন।

শ্বশুরমশায় খেতে ব'সে বললেন, 'এ কি, তোমার দাদা কোথায় ? তাকে ডাকো।'

সন্তর্পণে মহুয়া এল আবার উপরে।

দরজা খোলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল বারান্দা থেকে। দেখল স্নান ক'রে শুয়ে আছে। চোখ বোজা।

নড়ছে-চড়ছে ? নিশ্বাস পড়ছে ? না কি গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছে ?

নড়ছে-চড়ছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল মহুয়া। কাছে এসে দাঁড়াল। কাছে অথচ হাত বাড়িয়ে যাতে ধরতে না পারে। বললে, 'খাবে চলো নিচে। শ্বশুরমশায় ব'সে আছেন। তোমাকে ডাকছেন।'

চোখ খুলল না অমলেশ। বললে, 'নিচে যাব না। আমার ভাত এখানে নিয়ে এস। তোমারটাও নিয়ে এস। দু-জনে এক সঙ্গে ব'সে খাব।'

'তুমি অতিথি। তোমাকে অভুক্ত রেখে শ্বশুরমশায় খেতে পাচ্ছেন না।'

'তুমিই যখন আমাকে অভুক্ত রেখে খেতে পেরেছ তখন সকলেই পারবে। শোনো—'

আর দাঁড়াল না মহুয়া। নিচে এসে শ্বশুরমশায়কে বললে, 'খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে। বললে আরেকটু পরে খাবে। আপনি বুড়ো মানুষ ওর জন্যে ব'সে থাকবেন না।'

শ্বশুরমশায়ের খাওয়া হ'লে শাশুড়ি বললে, 'তুমি বরং ওর ভাতটা ওপরে রেখে এস ঢাকা দিয়ে। যখন ইচ্ছে হয় খাবে'খন।'

কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভ'রে গেল মহুয়ার। কি সুন্দর সংসার পেয়েছে সে। শ্বশুরশাশুড়ি কত উদার, কত স্বচ্ছচক্ষু। মহুয়ার প্রশংসায় দশ-মুখ। আর স্বামী ? স্বামী তো আর একজন্মের নয়। অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু। কত জন্মের পথ হাঁটছে একসঙ্গে।

বাটি সাজানো ভাতের থালা নিয়ে উপরে এল মহুয়া।

শ্বশুরমশায়কে তখন যা বলেছিল ছলনা ক'রে, তাইই তো ঠিক, ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঠের টেবিলটার উপর রাখল ভাতের থালা। ঢাকল টোপ দিয়ে।

তারপর ?

পা টিপে-টিপে দাঁড়াল এসে খাটের গা ঘেঁষে।

বুক-পকেট থেকে চিঠিটা উঁকি মারছে। ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটানে তুলে নিলে কেমন হয় ? কিন্তু তার চেয়ে ঐ পুরিয়াটা তুলে নিতে পারলেই বোধ হয় ভালো হ'ত। ঘড়ির পকেট থেকেই যে কাগজের কোণটা উঁকি মারছে ঐটেই বোধ হয় সেই পুরিয়া। আলগোছে ওটা টেনে নিতে পারলেই তো চুকে যায়। মূলে কুড়ুল পড়ে।

আরো একটু কাছিয়ে এল মহুয়া। হাতের চুড়িবালাগুলি উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে নিঃশব্দ করল। হাত বাড়াল। হাতের তিনটি আঙুল একত্র ক'রে উদ্যত করল।

আরেকটি নিশ্বাস মাত্র বাকি।

চোখ খুলল অমলেশ। বললে, 'কি নিতে চাও ? চিঠিটা ? একটা চিঠি সরিয়ে কি হবে ? এক ঝুড়ি চিঠি তারিখওয়ারি ক'রে সাজিয়ে রেখে এসেছি বাক্সে, দলিল হিসেবে। চিঠির ইতিতে, সেই সব তোমার ডাক, সী, হাসি, মউ, মধু, মহুয়া। তদন্ত করতে পুলিশের যাতে অসুবিধে না হয়। আর এইটে ? এইটে বিষের পুরিয়া নয়, এটা পুলিশের কাছে লেখা চিঠি। আমার শেষ চিঠি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় এই মামুলি মিথ্যে কথা লিখে যেতে পারব না। আমার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী তা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে যাব।'

কালো মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে মহুয়া বললে, 'মোটেই আমি তার জন্যে ঝুঁকি নি, দেখছিলাম সত্যি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ

কি না। যখন ঘুমোও নি তখন ওঠো। ভাত এনেছি খাবে এস।'

'ভাত এনেছ ?' উঠে বসল অমলেশ : 'তোমারটা ?'

'আমি নিচে ব'সে শাশুড়ির সঙ্গে খাব।'

'বেশ, যা এনেছ তা দু-জনে মিলেই খাওয়া যাবে ভাগ ক'রে। গোটা থালাটা নয় এক গ্রাস ক'রে হ'লেই যথেষ্ট। ভাত ডালের সঙ্গে মিশিয়ে ছোটো দুটো গরাস পাকিয়ে খেয়ে ফেলব দু-জনে। কই কোথায় ভাত ?' সহসা মহুয়ার বাঁ হাতটা চেপে ধরল অমলেশ।

আশ্চর্য, কি কৌশলে মহুয়া তক্ষুনি হাতটা ছাড়িয়ে নিল। আগে-আগে যেন জানত না এ কৌশল। এ কায়দাটা হালে শিখেছে। সাধ্যি কি অনাত্মীয় পুরুষ তার গায়ে হাত দেয়। তার হাতে এখন বজ্রের মতো লোহা, মাথায় শিখার মতো সিঁদুর।

হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রেও ধরতে পারল না দেখে অমলেশের মুখ ব্যথায় ভ'রে গেল। বললে, 'জীবনে তোমাকে পাশে পাই নি মরণে পাব এই আশা ক'রে এসেছিলাম। আমাকে দেখে তোমার এতটুকু দয়া হয় না ?'

'আমিই তো তোমার কাছে দয়া চাই। এক বিন্দু করুণা।' ভিক্ষুকের মতো বললে মহুয়া।

'তুমি পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হেরে গেছ, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজ, এখন, মরতে তোমার বাধা কি। এক মুহূর্তে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। এক মুহূর্তে সে কোন দেশান্তরে চ'লে যাওয়া। নতুন অদ্ভুত, না জানি কোন আরেক রকম অনুভূতি। আরেক রকম আকাশ আরেক রকম জলস্থল।'

'আমার মর্ত জলস্থলই ভালো।'

'জানি তাই তুমি বলবে। তবে আর কি, আমি একলাই যাব। তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চ'লে যাও।'

নিচু হ'য়ে হঠাৎ পায়ে পড়ল মহুয়া। কান্নালাগা ঝাপসা গলায় বললে, 'আমি তুচ্ছ আমি হীন আমাকে বাঁচাও। তুমি যদি নিজেকে বাঁচাও তা হ'লেই আমি বাঁচব। একটা ক্ষুদ্রপ্রাণ মেয়ের সাধ-ক'রে-গড়া খেলাঘর ভেঙে দিয়ে তোমার লাভ কি। তুমি মহৎ, তুমি নিঃস্বার্থ—'

হতাশের মতো খাটের উপর আবার শুয়ে পড়ল অমলেশ।

ভাতের থালার দিকে না গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল দেখে মহুয়ার আশা হ'ল। বিষ খাওয়ার চেয়ে মড়ার মতো প'ড়ে থাকাতেই যেন বেশি শান্তি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল মহুয়া। শাশুড়িকে বললে, 'ওর দেখি দিব্যি জ্বর এসে গেছে। খাবে না।'

'খুব জ্বর?'

'মন্দ কি। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম বেশ গরম।'

'আমি তখুনি চেহারা দেখে বুঝেছিলাম অসুস্থ। আহা, বেচারা, ইণ্টারভিয়ু কবে?'

'কাল। আজ তো ছুটি।'

শাশুড়ি-বউয়ে খেয়ে নিল।

'ওকে একটু দেখো গিয়ে মাঝে-মাঝে। যদি কিছু খেতে চায়—' স্বর্ণময়ী নিজের ঘরে গিয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

স্তব্ধ দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

কি করছে না জানি।

ভেবেছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখবে, তা নয়, খাটের

উপর ব'সে আছে। যেন বা উঁচু পাহাড়ের উপর ব'সে আছে। ঝাঁপ দিই কি না দিই এই দোদুল্যমান মুহূর্তের উপর।

'এ কি এখনো খাও নি?' অবাক হবার ভাব করল মহুয়া।

'আমার কি উদরের খিদে?'

'একটা তুচ্ছ মেয়ে তোমাকে আর কি দিতে পারে? নাও, খেয়ে নাও। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কি ভাবছেন বলো তো?'

'বেশিক্ষণ ভাবতে হবে না। এখন ক'টা বেজেছে?' খাট থেকে নামবার ভঙ্গি করল অমলেশ।

হঠাৎ কি হ'ল কে জানে, মহুয়া ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিল। কি দুরন্ত সাহস মেয়ের। তার হৃৎপিণ্ড যে ধকধক করছে তা যেন অমলেশও স্পষ্ট শুনতে পেল দূর থেকে।

উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। বললে, 'মরবে?'

'মরব।' নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মহুয়া। চাপা গলায় বললে, 'কিন্তু শোনো, শুধু আমি মরব। তুমি নয়। তুমি বাঁচবে।'

'আমি বাঁচব?'

'হ্যাঁ, তুমি বাঁচবে। তুমি পালাবে। বাঁচা মানেই কেবল পালানো। বর্তমান থেকে পালানো। পরিবেশ থেকে পালানো। তুমিও তেমনি পালিয়ে যাবে এ বাড়ি থেকে।'

'এ বাড়ির বাইরে এ মুহূর্তের বাইরে আর আমার জায়গা নেই।'

'আছে। অকারণে তুমি আমাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছ যার জন্যে নিজের প্রাণকে মনে করেছ ধুলো। আসলে আমি তুচ্ছ আমি অসার আমি অপদার্থ। অন্তত আজ, এখন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে তুচ্ছ ক'রে দাও, অপদার্থ ক'রে দাও। যাতে নিজেকে ঠিক মূল্য দিতে পারো! যাতে আমাকে ছুঁড়ে ফেলাতে পারো ফলের ছিবড়ের মতো,

তরকারির খোসার মতো। যাতে আমি এক নিমেষে তোমার কাছে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারি।'

চুলগুলি খ'সে গিয়েছে বুকে পিঠে, কি রকম অগোছালো চেহারা মহুয়ার।

অমলেশ চোখ বুজল।

'ও কি, চোখ চাও, দেখ। আমাকে দেখ।' যেন কেঁদে উঠল মহুয়া।

'ক্ষমা করো। প্রেম অন্ধ, জন্মান্ধ। কি সে দেখে কে জানে। কিন্তু যা সে দেখে তাই সে দেখুক। এর বাইরে আর কিছু তার দেখবার নেই। তার চেয়ে খাবারের ঢাকাটা তোলো, চারটি ভাত খাই। ভাত অনেক বেশি মিষ্টি।'

'খাবে? এস। আমি মেখে দি।' যেন বিপদ কেটে গিয়েছে এমনি সর্বভোলা সুখে ভাতের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মহুয়া। খাট ছেড়ে অমলেশও নেমে এল। ঢাকা তুলে ফেলে মহুয়া ভাতের সঙ্গে ডাল মাখল। নাও, আমি খাইয়ে দিই। গরাস পাকিয়ে তুলতে যাচ্ছে অমলেশের মুখের দিকে, অমলেশ পকেট থেকে কাগজের পুরিয়া বের ক'রে খানিকটা গুঁড়ো তাতে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি প্রথমে খাও। আমি পরে খাচ্ছি, নির্ঘাত খাচ্ছি।'

আর্তনাদ ক'রে উঠল মহুয়া। এ কি, ঘরের দরজা যে বন্ধ।

অমলেশের হাতটা ঠেলে দিয়ে মহুয়া ছুটল দরজার দিকে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল অমলেশ। কি অভ্রান্ত কৌশল শিখেছে মহুয়া, ব্যূহ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। চকিত-তড়িতের মতো দরজা খুলে একেবারে বারান্দায়।

'কি, কি হ'ল।' স্বর্ণময়ী ছুটে এলেন।

'লোকটা ভালো নয়। লোকটা গুণ্ডা। আমাকে খুন করতে চায়।'

স্থাণুর মতো এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন স্বর্ণময়ী। শেষ সাহসে ভর ক'রে এগুলেন দরজার দিকে। দরজা বন্ধ।

চাপা গলায় বললেন, 'দাঁড়াও, ওঁকে তুলি। পুলিশে খবর পাঠাই।'

পুলিশে খবর না পাঠিয়ে উপায় ছিল না।

দরজা আর খোলে না ভিতর থেকে। বিকেল পেরিয়ে গেল, তবু না।

পুলিশ এসে দরজা খুললে। মেঝের উপর ম'রে প'ড়ে আছে অমলেশ।

বাড়িটার চারদিকে যেন আগুন লেগে গেল। লোকে লোকারণ্য। লোকের আগুন। লজ্জার আগুন, অপমানের আগুন। আতঙ্কের ধূম্র-কুণ্ডলী।

সকলের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। মহুয়ার হাত-পা ঠাণ্ডা। চোখের সামনে দেখতে পেল একটা হাঁ-মেলা অন্ধকার। প্রকাণ্ড কালো শূন্য। সমস্ত ভবিষ্যৎ দিয়েও যেন সে শূন্য ভরাট হবার নয়।

'কি ভয়ংকর লোক বাবা। পকেটে বিষ নিয়ে এসেছিল।' নিজের ঘরে তাঁর পাশে বসিয়ে মহুয়ার গায়ে পিঠে হাত বুলোচ্ছেন স্বর্ণময়ী। বললেন, 'আমার সোনার প্রতিমা বউ যে রক্ষা পেয়েছে, এই আমাদের ভাগ্যি।'

'বউমা, এদিকে এস। দারোগাবাবুর কাছে জবানবন্দি করতে হবে।' শ্বশুরমশায় মহুয়াকে ডাকলেন।

এতটুকু পা টলল না মহুয়ার। শোভনসংবৃত হ'য়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়াল দারোগার সামনে। নিষ্কম্প বৈজ্ঞানিক গলায় বললে, 'হ্যাঁ, আমাকে

ভালোবাসত, কলেজের ছেলেছোকরারা যেমন বাসে। মফস্বলের এক শহরে পাশাপাশি বাড়ি, যেমন হ'য়ে থাকে। চিঠি লেখালেখি হ'ত। পকেটে যে চিঠি পেয়েছেন, তা আমারই লেখা। অমনি এক-আধখানা নয়, ঝুড়ি-ঝুড়ি লিখেছি। লোকটাকে ভালো লাগত ব'লে নয়, চিঠি লিখতে ভালো লাগত ব'লেই চিঠি লেখা। মনের কাঁচা রঙিন অবস্থার সঙ্গে প্রেমে পড়া। অন্নে সুখ নেই, আমাকে বিয়ে করতে চাইল। তৈরি ছেলে নয়, আমার বাবা-মা রাজি হলেন না। তাঁদের সেই অসম্মতিতে আমারও সমর্থন ছিল। আমাকে বলেছিল অপেক্ষা করতে। কতদিন করতে হবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। আমি রাজি হলুম না। আমার যোগ্য ঘর-বর মিলে গেল, বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। সুখের রাজ্যে পা দিলুম। সেই থেকেই রাগ। সেই থেকেই আমাকে খুন করার মতলব। আমাকে মারতে না পেরে শেষে নিজে মরল।'

'কে আছে ওর জানেন?'

'ইস্কুলমাস্টার বাবা আছে শুনেছি। আর দাদারা আছে।'

স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন বিবৃতি। সত্যের সুর বাজানো। পুলিশ বিশ্বাস করতে বেগ পেল না।

কি জঘন্যভাবে মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল মর্গে। একটা কুকুর-বেড়ালের মতো। ছোটো ময়লাফেলা গাড়ির মধ্যে পুঁটলি পাকিয়ে। একটু ফুল নয়। চন্দন নয়। এক ফোঁটা চোখের জল নয়।

আত্মীয়স্বজন সবাই মহুয়ার তারিফ করলে। বিদুষী, কুশলী মেয়ে। আততায়ীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে, পুলিশের হাত থেকে পরিবারকে।

টেলিগ্রাম গেল সোমনাথের কাছে। শিগগির চ'লে এস।

মহুয়ার অসুখ? আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা? স্টোভ? ছাদ? বাথরুম? বাবা-মার কিছু হ'লে নিশ্চয়ই বিতং ক'রে লিখত। শুধু কাম্ শার্প যখন, তখন মহুয়ারই কোনো বিপদ।

মহুয়ার যেন কিছু না হয়। মহুয়াকে যেন ভালো দেখি। স্বাস্থ্যে সুখে লাস্যে লাবণ্যে উজ্জ্বল দেখি তার উপস্থিতি।

স্টেশনে পা দিয়েই নানা গুজব শুনতে পেল। কেউ বললে ছোবা, কেউ বিষ, কেউ অ্যাসিড বাল্‌ব। কিন্তু যাই বলো ধুরন্ধর মেয়ে। সব কিছু বাঁচিয়ে দিয়েছে। দিব্যি বেরিয়ে এসেছে পাশ কেটে। আর, যার মরণ যেখানে মাটি কেনা সেখানে। নইলে কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।

মেয়ের কিছু হয় নি?

একটি আঁচড়ও লাগে নি।

বাড়ি এসে ডাক দিল: 'মা. মহুয়া কোথায়?'

কি না জানি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে, মহুয়ার বুকের মধ্যে গুরগুর ক'রে উঠল। পায়ের তলা থেকে শক্ত মাটি স'রে যায় বুঝি। কিন্তু বিপদের সামনে ঘাবড়াবে না. এই তো তার প্রতিজ্ঞা। কেন, কি হয়েছে? কিছুই হয় নি! মোটরের নিচে প'ড়েও তো কত লোক মরে। কত লোক বা জনতার মধ্যে প'ড়ে আকস্মিক গুলিতে। আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখল মহুয়া। ভয় বা মালিন্য অপরাধীর লজ্জা বা বিনয় লেশমাত্র আভাসটুকুও মুছে ফেলল। স্বাভাবিকতায় ঝলমল ক'রে উঠল। তারো চেয়ে একটু বা বেশি। স্বামী এসেছে, তাকে পাওয়ার গৌরবে হ'য়ে উঠল যেন আনন্দের প্রতিমা। সিঁদুর অনেকেই পরে. কিন্তু ঝলক দিতে পারে ক'জন!

হাসিভরা মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার? কেমন আছ?' আপাদমস্তক তাকিয়ে জিগগেস করল সোমনাথ।

'নিটুট আছি। নিখুঁত আছি।' আহ্লাদের চাঁদের মতো মুখ ক'রে বললে মহুয়া।

'আর ঐ লোকটা? কে ঐ লোকটা?'

'বুঝতেই পাচ্ছ, ছেলেবেলার বয়-ফ্রেণ্ড যেমন থাকে, তেমনি।'

'যাকে বলে কাফ-লাভ, বাছুরে-পীরিত। হা হা হা।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সোমনাথ: 'তারপর কি ক'রে মরল?'

'মরল মানে? ধরাতল থেকে বিদায় নিল। কি আস্পর্ধা, কোত্থেকে এসেছে সব খবর নিয়ে। আমাকে বিষ দিয়ে বললে, তুমি আগে খাও, তারপরে আমি খাব।'

'কাওয়ার্ড।'

'আমি বললাম, তুমি পীরের কাছে মামদোবাজি করতে এসেছ? আমি খাব কেন? আমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব? একটা তুচ্ছ ছেলেমানষির জন্যে এত লোকসান? তোমার সখ হয়েছে তুমি খাও। তারপর আমার উপর জোর দেখাতে চাইল, গায়ের জোর—'

'লম্পট, দুশ্চরিত্র!' গর্জন ক'রে উঠল সোমনাথ।

'আমার সঙ্গে চালাকি! একটা ঘুরনা মেরে ক্লিন্ বেরিয়ে এলাম।'

'দরজা বন্ধ করতে পারে নি তো?'

'সেই দিকে আমি খুব সজাগ ছিলাম। দরজার কাছে-কাছেই ছিলাম যাতে হঠাৎ না বন্ধ করতে পারে। আর বন্ধ করলেই বা কি, ধস্তাধস্তিতে পারত নাকি আমার সঙ্গে?' সুবলিত বাহুর একটা ঝঙ্কার দিল মহুয়া।

'উঃ, কি বিপদ থেকেই না রক্ষা পেয়েছ।' প্রায় স্তবের মতো সুরে

বললে সোমনাথ। তারপর হঠাৎ কৌতূহল মিশিয়ে: 'পুলিশ কি বলছে?'

'স্যুইসাইড।'

বাবা-দাদাদের কাছেও খবর করেছে পুলিশ।

বাবা চিঠি লিখেছে মহুয়ার শ্বশুরমশায়ের কাছে, ক্ষমা চেয়ে। কোনোই নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষা হয় নি। ছেলেবয়স থেকেই পথভ্রান্ত। তাই এই পরিণাম। আপনাদের সম্ভ্রান্ত পরিবার, আপনাদের বাড়িতে উঠে আপনাদেরকেই বিব্রত করল লাঞ্ছিত করল আমার এ দুঃখও দুর্বহ।

বড়দা নিজে এল সনাক্ত করতে। বিড়ম্বিত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে। বলছে, 'একটা আস্ত মস্ত ইডিয়ট। কলেজে পড়লে কি হবে এক পিপে ধোঁয়া। খালি বাজে ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে, সিগরেট ফুঁকেছে। নইলে কেউ মরে? মরবি তো এমনি একটা অভিনয় করার কি দরকার? মাসে-মাসে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করেছে, তা দিয়ে দেখেছে কেবল সিনেমা নয়তো কিনেছে যত ছবিওলা বিদেশী পত্রিকা! শুধু-শুধু একটা নিরীহ ভদ্র পরিবারকে বিপন্ন করা। কোথায় লোকে পরের জন্যে জীবন দেয়, তা নয়, এ হচ্ছে পরের জীবনকে মাটি করার চেষ্টা।'

সোমনাথের মনের চেহারা আরো বৈজ্ঞানিক।

বিয়ের আগে বড়ো হচ্ছে আজকালকার মেয়েরা, এমনি এক-আধটা ঘটনা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ইস্কুলের নিচু ক্লাসের মেয়েদেরও জিগ্গেস করো, তাদেরও এক বা একাধিক লাভার আছে। লাভার থাকাটাই ফ্যাশান। এতে দোষের কি। তা হ'লে ছেলেবেলা মাম্প্স হওয়াও দোষের।

পর্বতের চূড়ার মতন তার স্বামী। এই ঢাক ফেলে মহুয়া একটা ট্যামটেমির সঙ্গে চলেছিল!

'চলো তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাই।'

মা-বাবা আর বাধা দিলেন না। স্বর্ণময়ী বললেন, 'তারই জন্যে তোকে এনেছি তার ক'রে। এখানে লোকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কেবল বউ দেখতে বাড়িতে ভিড় করবে।'

'যেন ঝাঁসির রানি।' স্বামী-স্ত্রীতে দু-জনেই হেসে উঠল।

'সব ব্যাপার তো বুঝবে না, নিন্দে করবে।'

'তা হ'লে তরকারি কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেললেও যেন নিন্দে করে।' স্বামী-স্ত্রীর আবার সম্মিলিত হাসি।

সেই থেকেই মহুয়া কেবল হাসে। কেবল হাসে। কথায়-অকথায় হাসে। এক মুহূর্ত তার স্তব্ধ থাকার, বিমনা থাকার, গম্ভীর থাকার উপায় নেই। সব সময়ে সে হাসে। সাজে-গোজে। উৎসবের মশাল জ্বেলে বেড়ায়।

লোকে বলে, ব্যারাম।

মহুয়া বলে, হাসব না তো কি। আমার নামই যে হাসি।

ক'টা দিন এ-মেসে ও-মেসে কাটিয়ে সম্প্রতি একটা দু-কুঠুরি ফ্ল্যাট পেয়েছে সোমনাথ। আর তাতে সংসারের জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে মহুয়া।

সোমনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে ঝগড়া হবার উপক্রম হয়। ঝগড়া জমতে দেয় না। চট ক'রে হেসে ফেলে। স্বামীর সোনার থালে অভিমানের জাউ খাবার তার সাধ নেই।

জানলায় বসে না। অন্যমনস্ক হয় না। মুখভার ক'রে থাকে না। জোরে নিশ্বাস ফেলে না। ঘুমোয় না অসময়ে। শতসহস্র কাজ করে।

বৃষ্টিতে ভেজে না। চাঁদ দেখে না। চুল আবাঁধা রাখে না। উপন্যাস

পড়ে না। পুরোনো বাক্সপত্তর ঘাঁটে না। স্বামীকে নিয়ে এখানে-ওখানে বেড়াতে যায়। যত রাজ্যের ফাংশান হচ্ছে শহরে তার টিকিট কেনে।

আর থেকে-থেকে বাড়িতে উৎসব করে।

একে নেমন্তন্ন ওকে নেমন্তন্ন। যাতে লোকের সামনে নিজের সাফল্য নিজের চরিতার্থতা জাহির করতে পারে। অন্যকে নিজের সুখটা দেখাতে না পারা পর্যন্ত সুখ নেই।

প্রথমে বিয়ের বার্ষিকীটা করল।

পরে সোমনাথের জন্মদিন।

নিজের জন্মদিনটাও করবে নাকি ? দেখি ওঁর মনে আছে কিনা। স্ত্রীর জন্মদিনের উদ্যোগ-আগ্রহ তো স্বামীর দিক থেকেই আসা উচিত।

কিন্তু উচিত ভেবে তো চুপ ক'রে থাকা চলে না। আরেকটা উৎসবের সুযোগ হেলায় নষ্ট করি কেন ? অভিমান ক'রে লাভ কি। ক'টা স্বামীই বা স্ত্রীর জন্মদিন মনে ক'রে রাখে।

স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে মহুয়া বললে, 'আজ আমার জন্মদিন, তোমার খেয়াল নেই ?'

'আশ্চর্য, আমার কি ভুলো মন !' সোমনাথ আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠল : 'কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করছ ?'

'কাউকে না। শুধু তুমি আর আমি।'

'না, না, আপিসের বন্ধুদের বলি। তারা সস্ত্রীক আসুক। তাদের স্ত্রীরাও তো তোমার বন্ধু।'

আয়োজন হ'য়ে গেল।

হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ স্ফূর্তি।

ঝলমলে দামি শাড়ি দিয়েছে সোমনাথ। রাত্রে সেই শাড়ি প'রে স্বামীর কোলে নিজেকে ঢেলে দিয়েছে মহুয়া। বললে, 'কি সুন্দর আমাকে দেখাচ্ছে বলো তো।'

মহুয়ার চুলের মধ্যে হাত বুলুতে-বুলুতে সোমনাথ বললে, 'কিন্তু আজ তো তোমার জন্মদিন নয়।'

'নয়?' এক ফুঁয়ে সমস্ত মুখ যেন নিবে গেল মহুয়ার। ঝটকা মেরে উঠে প'ড়ে বললে, 'সে কি, আজই তো একুশে ভাদ্র।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার জন্মদিন এগারোই। যেদিন—'

'যেদিন—' যেন আরেক জগৎ থেকে কথা বলছে মহুয়া।

'যেদিন অমলেশ তোমার কাছে এসে মরে। মনে নেই?'

'মরুক। সবই তো ম'রে গেছে। অতীতের সবই যদি ম'রে গেল জন্মদিনটাও কি মরবে না?' হোহো ক'রে হেসে উঠল মহুয়া।

সোমনাথের মনে হ'ল সবই মরে। দিন মরে রাত মরে রূপ মরে যৌবন মরে কাম মরে প্রেম মরে, কিন্তু কান্না মরে না।